আপন দেশ

নিখিলরঞ্জন রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া,
৩।১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট
বিমল দাশ

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডাস

দু টাকা পঞ্চাশ ন. প.

উৎসর্গ

আগামী দিনের ভারত-পথিক
অণু-ঝুণু-গুপুকে

লেখকের অন্যান্য বই

সমাজশিক্ষার ভূমিকা

জনশিক্ষার কথা

অন্য দেশ

Never Too Late

"A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it."

টোডাদের বাসগৃহ, নীলগিরি

জলমহল, উদয়পুর

রাজপুত সুন্দরী

নয়নাভিরাম নীলগিরি

সার্থক নাম নীলগিরি! শ্যাম ধরিত্রী ও অনন্ত নীলিমার কি স্নিগ্ধ, নিবিড় আলিঙ্গন—bridal of the earth and sky! চন্দ্রকরস্নাত নির্মল নির্মেঘ আকাশের পটভূমিকায় প্রথম যে মুহূর্তে দূর হতে নীলগিরির দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণীর অনুপম শোভা দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল সেই মুহূর্তেই 'প্রথম দর্শনে অনুরাগ' এই বহুপ্রচলিত কথাটির তাৎপর্য যেন মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। সত্যই এই অপরূপ দৃশ্যাবলীকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

স্বভাবসৌন্দর্যের অপূর্ব মোহিনী মায়ায় সমগ্র চেতনা বিমুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বহুদিন আগে দেখা নীলগিরির স্মৃতি আজও কর্মহীন অলস মুহূর্তগুলিকে মধুর ও পরিপূর্ণ করে তোলে। স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বোধ করি এইরূপ অনুভূতিই হয়েছিল, মাঠভরা বনজকুসুম ড্যাফডিল্‌সের অকৃপণ সম্ভার দর্শনে এবং যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনবদ্য ছন্দে—'They flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude.' ঊর্ধ্বে অনন্ত নীল আকাশ, আর নিম্নে শ্যামলাঞ্চলা বসুন্ধরা—এই দুইয়ের মিলনের সংযোগ-

সেতু রচনা করেছে নীলগিরি। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যপটের মাধুর্য শুক্লা রাত্রির মোহনস্পর্শে মধুরতর হয়ে উঠেছে।

ওই যে ঝল্‌মল্‌ চন্দ্র সুন্দর
জ্বলছে জল্‌জল্‌ হাসছে অম্বর

উর্ধ্বে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে প্রকৃতির এক মনোহারিণী নীলাম্বরী বেশ, নীল-সবুজের এক রহস্যময় স্বপ্নালোক।

* * * *

মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম উপান্তে নীলগিরি। এই পাহাড়শ্রেণীর শিখর ও সানুদেশে অবস্থিত জনপদগুলি নিয়েই নীলগিরি জেলা। আয়তন ৯৫৭ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ সত্তর হাজার। জেলার প্রধান শহর বিখ্যাত উতকামন্দ বা সংক্ষেপে উটি ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর পার্বত্য-শহরগুলির অন্যতম। মহীশূর থেকে একটানা ১১২ মাইল পীচ-ঢালা পথে মোটরযোগে উতকামন্দ রওনা হলাম। নভেম্বর মাসের শেষভাগ। মহীশূরেই তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। উতকামন্দের তীব্র শীতের কথা স্মরণ করিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ শীতবস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে ও অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে সবাই বারবার উপদেশ দিলেন। দীর্ঘ পথ—মাইল ত্রিশেক অতিক্রান্ত হবার পর থেকেই চড়াই শুরু হল। দুই পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট পাইন ও দেওদারের বন, সম্মুখে বিসর্পিল পার্বত্যপথ। পথের একদিকে গগনচুম্বী পর্বতের প্রাচীর ও অন্যদিকে অতলস্পর্শী খাদ। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

দূরে অদ্রিশৃঙ্গের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করছিল। ক্রমে চাঁদের আলোয় সমগ্র পর্বত, বনভূমি ও উপত্যকাদেশ সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে আমাদের মোটরখানা সগর্জনে ডবল্‌গিয়ারে ধীরে মন্থরে ঊর্ধ্বমুখী ছুটে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই শীতের অনুভূতিও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা চলার পর যখন উতকামন্দে এসে পৌঁছলাম, তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। সমুদ্রতীর হতে উতকামন্দের উচ্চতা ৬৫০০ ফুট, প্রায় দার্জিলিং-এর কাছাকাছি। পূর্বব্যবস্থামত স্যাভয় হোটেল নামক এক শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত পান্থনিবাসে গিয়ে উঠলাম। বাইরের তীব্র শীতে, বিশেষ করে চলতি মোটরে দীর্ঘপথ অতিবাহনের ফলে এতক্ষণে হাড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছে। হোটেলে ফায়ারপ্লেস ও কৃত্রিম উপায়ে উষ্ণীকৃত ঘরের ব্যবস্থা আছে। পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই গরম গরম সুস্বাদু ডিনার খেয়ে যে যার নির্দিষ্ট কক্ষে সুসজ্জিত বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম। পথশ্রমের ক্লান্তির দরুনই হউক বা শয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যই হউক, সে রাত্রির মতো এমন সুন্দর ও গভীর নিদ্রা খুব সচরাচর উপভোগ করি নি।

*   *   *   *

উতকামন্দ বা উটি শহরটির পরিকল্পনা ও পরিবেশ অনিন্দ্য-সুন্দর। ভারতের সৌন্দর্যভূমি বা beauty spot হিসাবে এর একটা সুনাম ও স্বাতন্ত্র্য আছে। অনেকে বলেন যে, প্রাকৃতিক শোভার দিক থেকে মুশৌরীর পরেই নাকি উটি। তুলনার

কথা না হয় থাক। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আবহাওয়ার দিক দিয়ে উটির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। অনেকেই শীতের বেজায় ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার মতো শীত-কাতুরে লোকেরও কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং আরামই অনুভব হয়েছে। আমাদের আসার কিছুদিন আগেই অর্থাৎ নভেম্বরের গোড়ার দিকেই নাকি একাদিক্রমে ৩।৪ দিন নিরবচ্ছিন্ন তুষার-পাত বা snow-fall হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের তুষারপাত নাকি মারাত্মক। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যে কয়দিন আমরা এখানে ছিলাম, সে কয়দিনই ভারী সুন্দর কেটেছে, বৃষ্টি বা তুষারপাত কোনটাও হয় নি। আকাশ ছিল মেঘহীন স্বচ্ছ নীল। সূর্যকরোজ্জ্বল দিনগুলি কি সুন্দর ও আরামপ্রদ। শীত তীব্র কিন্তু মোটেই অসহ্য নয়। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা ঠিক হবে না—

'দারজিলিং-এর তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে
একটা খদর চাদর হলেই শীত ভাঙানো সম্ভবে।'

খদ্দর চাদরে শীত ভাঙানো যায়, এ কথা বললে উটির শীতকে রীতিমতো উপেক্ষা করা হবে। তবে যে কয়দিন আমরা এখানে ছিলাম, আমাদের ভাগ্যক্রমে শীতের প্রকোপ সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। উটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গাছপালা ও বিচিত্র ফুলের সম্ভার। নীলগিরির শীর্ষদেশে এই সুন্দর ছোট্ট শহরটি চিত্রপটের মতো অপরূপ শোভায় মণ্ডিত। পাহাড়গুলিরই বা কি রূপ, নীল ও শ্যামলিমার কি অফুরন্ত সমারোহ! পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত

বিচিত্র বর্ণের ও বিভিন্ন জাতীয় অজস্র গাছ লতাপাতা প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবকে সমাচ্ছন্ন!

কবির কথা মনে পড়ে—

'বেশ আছি এই বনে বনে
যখন তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।'

পাহাড়ে ও বনে বনে সারাদিন পাখির কলমহোৎসব লেগেই আছে।

উতকামন্দের অনতিদূরে কোন্নুর। কোন্নুরের সরকারী ভেষজ গবেষণাগার একটি দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান। যে কয়দিন উতকামন্দে ছিলাম খুবই ভালো কেটেছে। খুব ভোরে উঠতাম—বাইরে কনকনে শীত, গায়ে গরম জামাকাপড় না চাপিয়ে বেরুবার উপায় নেই, কিন্তু হোটেলের ঘরগুলি ভারী আরামপ্রদ। প্রাতরাশের পরই বেড়িয়ে পড়তাম শহর পর্যটনে। প্রতিদিনই নূতন নূতন দিক আবিষ্কার করে আসতাম। স্যাভয় হোটেলের ঠিক পিছনেই যে পাহাড়টা, একদিন একটা পায়ে-চলার পথ বেয়ে তারই চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। আমার ধারণা ছিল যে, পাহাড়ের অধিত্যকা দেশ অনধ্যুষিত, কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে, পাইন গাছের অন্তরালে একটি ছোটখাট গ্রাম লুকানো রয়েছে। এই গ্রামের অধিবাসীরা আদিম কোডা-জাতীয়। সংখ্যায় খুব বেশী নয়। ঘর-দোর ও জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখে মনে হল যে, এদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই হীন,—

সভ্যতার মাপকাঠিতে এরা একান্তই অনগ্রসর,—এখনও সেই আদিম অন্ধকার যুগের প্রান্তদেশেই পড়ে রয়েছে। গাছের ডাল ও পাতায় রচিত ছোট ও নীচু এদের ডেরাগুলির না আছে কোন ছাঁদ না আছে কোন শ্রী। পশু ও মানুষ একত্রে ঘেঁষাঘেষি হয়ে এই ডেরাতেই রাত কাটায়। এদের বেশ-ভূষারও বিশেষ কোন বালাই নেই। প্রচণ্ড শীতেও একখণ্ড কটিবাস ও পাতলা গাত্রাবরণ মাত্র সম্বল। এত দরিদ্র যে, ত্নবেলা পেট ভরে আহার জোটে কি না সন্দেহ। জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন আলুর চাষ বা দিনমজুরি। অন্যান্য বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো জীবন-সংগ্রামের কঠোর প্রতিযোগিতায় পরাভূত এই কোড়া জাতিও শনৈঃ শনৈঃ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কোড়ারা অ্যানিমিস্ট বা দেবতাজ্ঞানে জড় পদার্থের উপাসক। বন্দীপুরের গভীর বনে কোড়াদের একটি মন্দির দেখতে পেরেছিলাম—মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরী অনেকটা উইয়ের ঢিপির মতো দেখতে। অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ বা মূর্তি দেখা গেল না। অন্যত্র কোড়াদের আর একটি মন্দির দেখেছিলাম—সেটা ছিল বাঁশ ও বেতের তৈরী অনেকটা শঙ্কু বা cone-এর আকারের। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্রমশ ক্ষীয়মাণ এই কোড়া জাতি এখনও পর্যন্ত তার আদিম স্বকীয়তা আঁকড়ে ধরে সর্বগ্রাসী সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে। প্রগতিশীল সভ্যতার প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে ভারতের তথা জগতের প্রাচীনতম মানুষের বংশধর এই অনাদৃত ও অবজ্ঞাত কোড়াজাতি

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলের কারণস্বরূপ হয়ে আজও পর্যন্ত কোনও মতে নিজ অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে। কিন্তু এ তার ব্যর্থ প্রয়াস। জীবনসংগ্রামের প্রচণ্ড সংঘাতে এদের অবলুপ্তি অনিবার্য।

নীলগিরি জেলায় মোপলাদেরও বাস। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে মোপলা বিদ্রোহের লোমহর্ষণ কাহিনী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বেশ কিছু চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল। মোপলারা নামে মাত্র মুসলমান—ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁদের চিরাচরিত ভেদনীতিমূলক সাম্রাজ্যবাদের খাতিরে এদেরকে আদমস্থমারীতে মুসলমান বলেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই মুসলমানত্বের কোন পরিচয়ই এদের নেই। নিতান্ত দরিদ্র, অর্ধনগ্ন, অনশনক্লিষ্ট ও অশিক্ষিত এই শ্রেণীর লোকেরা বহুক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে সৃষ্ট ভারতের সাম্প্রদায়িক অনলের ইন্ধন জুগিয়েছে। মোপলারা আসলে ছিল হিন্দু এবং এদের পেশা হচ্ছে ধীবরের বৃত্তি। সংকীর্ণ আত্মঘাতী হিঁদুয়ানির নির্যাতনেই এরা সমাজচ্যুত হয়ে মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু এদের আবার হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয় না। একটু উদার মনোভাব নিয়ে এদের আবার বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ হবে।

*　　*　　*　　*

আঁতিপাঁতি করে উতকামন্দের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নিলাম। প্রধান দর্শনীয় স্থান হচ্ছে সরকারী পুষ্পোদ্যানটি। একটা পিরামিডাকৃতি পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে এই মনোহর উদ্যানটি রচিত হয়েছে। পাদদেশ হতে চূড়া অবধি সমগ্র পাহাড়টিকে বেষ্টন করে স্পাইরেলের মতো পথ কাটা আছে। ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটে বা মোটরগাড়িতে একেবারে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ওঠা যায়। পাহাড়ের মাথায় উঠে উতকামন্দের ও নীলগিরির শোভা ভারী চমৎকার দেখায়। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দেখা যায় দূর পাহাড়ের গায়ে গায়ে লঘুপক্ষ শুভ্র মেঘের দল থরে থরে সজ্জিত। সুদূর অতীতে কবির কল্পলোকে রামগিরির গাত্রসংলগ্ন আষাঢ়ের নবীন নীরদমালা দর্শনে বিরহী যক্ষের প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ-কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি-প্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।

মহাকবি কালিদাস হতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় কবিশ্রেষ্ঠগণ যুগে যুগে নানা অভিনব ছন্দে মেঘ-মহিমা কীর্তন করে গিয়েছেন। পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়িয়ে দূর জনপদগুলির বৈদ্যুতিক আলোকমালার রশ্মিজাল বনে বনে খদ্যোতপুঞ্জের ঝিকিমিকি বলে ভ্রম হয়।

*　　*　　*　　*

আমি বাঙালী। স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই বাঙা খোঁজ নিলাম। কিন্তু এই সুদূর উতকামন্দে বাঙালীর সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুইজন বঙ্গসন্তানের সন্ধান পাওয়া গেল। এঁরা স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সংস্কৃতি কেন্দ্রের সন্ন্যাসী। মাদ্রাজ এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র, সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে উতকামন্দ আশ্রমে রয়েছেন। এঁদের আদি বাস পূর্ববঙ্গে। পরস্পর পরমাত্মীয়বোধে বহুক্ষণ আলাপাদি হল। রাজনীতি ও ব্যবসা প্রতিযোগিতায় আজ সর্বভারতে বাঙালীর স্থান ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে বলে একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। তাই এই দূর স্থানেও সমাজহিতার্থে নিবেদিতপ্রাণ দুইজন বাঙালী সাধুর সান্নিধ্য বড়ই প্রীতিকর বোধ হল। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এঁরা। নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ যে বাঙালী সন্ন্যাসীর প্রতিভা একদা সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছিল, তাঁরই প্রতিভূরূপে আজও দূর দুর্গমে বাঙালীর ছেলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাধনায় নিয়োজিত রয়েছে—এ দেখলে প্রাণে আশা ও ভরসার সঞ্চার হয় বই কি!

টিপু সুলতানের দেশে

হায়দর আলী-টিপু সুলতানের দেশ মহীশূর। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ভারতে ইতিহাসের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে যে কয়েকটি বিশিষ্ট অভিনেতার আবির্ভাব হয়েছিল, হায়দর আলী, টিপু সুলতান তাঁদের অন্যতম। সামান্য সিপাহীর পুত্র ছিলেন হায়দর। দুর্জয় সাহস, উচ্চাভিলাষ এবং আত্মবিশ্বাসের প্রসাদে সামান্য সৈনিক হতে মহীশূর রাজ্যের সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন। সামান্য সিপাহী হায়দার যুদ্ধে কৌশল ও অকুতোভয়তা দেখিয়ে ক্রমশই ধাপে ধাপে উপরে উঠেছিলেন। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, হায়দরের পক্ষে আর আজ্ঞাবহ কর্মচারীর পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব হল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবেকবিহীন। সিদ্ধিলাভেই সাধনার সার্থকতা— উচ্চাকাঙ্ক্ষী হায়দরের এই হল নীতি। স্বীয় প্রভু ও অন্নদাতা দলবই নন্দরাজাকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে করলেন হত্যা, এবং পরাক্রান্ত হিন্দুমন্ত্রীকে করলেন বন্দী। উত্তরাধিকারী হিন্দুরাজাকে প্রথমেই রাজ্যচ্যুত করলেন না—তাতে কিছুটা গোলযোগ বা দুর্নামের আশঙ্কা। রাজাকে সাক্ষীগোপাল রেখে নিজেই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর শুরু হল রাজ্য-বিস্তার অভিযান। মহীশূরের আশেপাশের ছোট ছোট রাজা

বা পলিগারগণ হায়দরের বিক্রমের সম্মুখে টিকে থাকতে পারলেন না—একে একে পরাজয় ও বিলুপ্তি বরণ করে নিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে লাগল বিরোধ, ইংরেজ হল রাজ্যবিস্তারে প্রতিবন্ধক। পর পর দুইবার বড় সংঘর্ষে হায়দরের হাতে ইংরাজকে নাকাল হতে হয়েছিল।

হায়দার আলীর ছেলে টিপু। হায়দরের মৃত্যুর পর টিপু হলেন মহীশূরের সুলতান বা রাজা। বলাবাহুল্য হিন্দুরাজা ইতোপূর্বেই মানে মানে সরে পড়েছিলেন বা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। টিপু সুলতানের সম্বন্ধে ইতিহাসের অভিমত নিরপেক্ষ নয়। কেউ বলে টিপু সুলতান ছিলেন পরধর্মবিদ্বেষী ও অত্যাচারী। আবার কেউ বলেন টিপু ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক, হিন্দুমন্দির সংস্কারে মুক্তহস্তে দানশীল। একটা বিষয়ে মতের অনৈক্য নেই—সামরিক প্রতিভা। পিতা পুত্র উভয়েই ছিলেন অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী।

যুগে যুগে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে যে দুটো জিনিস সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে, প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ একতার অভাব আর দ্বিতীয়তঃ রণকৌশল এবং যুদ্ধাস্ত্রের মান্ধাত্ব বা রক্ষণশীলতা। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার, শিহাবুদ্দীন ঘোরী, বাবর শাহ, আহমদ্ শাহ দুর্‌রাণী, ক্লাইভ, হেস্টিংস ও লর্ড ওয়েলেসলী প্রভৃতি ভারত-বিজেতৃগণ প্রত্যেকেই ভারতবাসীর এই মারাত্মক দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ভারতের রাষ্ট্রীয়

গগন আসন্ন দুর্যোগের আভাসে আতঙ্কিত। একদিকে দিল্লীর বাদসাহী তখ্ৎ-তাউস অকর্মণ্য, রাজ্যলোভী, হীন চক্রীগণের খেয়ালের ক্রীড়নক, মোগল ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত, এবং তৃতীয় পানিপথের নিদারুণ আঘাতে মারাঠাশক্তি পঙ্গুপ্রায়, আর অন্য দিকে দূর সিন্ধুপারের শ্বেতাঙ্গ বণিকদল সেই খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতে ছলেবলে কৌশলে তাদের প্রভুত্ব ও রাজ্য-বিস্তারে সচেষ্ট। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে। এই হচ্ছে সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা।

হায়দর আলী এবং টিপু সুলতানের সামরিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এঁরা উভয়েই মামুলী ঢাল তরোয়াল ছেড়ে ইউরোপীয় প্রথায় নিজ নিজ সৈন্যদল গঠন করতেন। এঁরা সুদক্ষ ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্যে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গঠিত করেছিলেন। সেই সময় ইউরোপ থেকে যে নূতন ধরনের বন্দুক-কামান প্রভৃতি আমদানি হচ্ছিল, সে সম্বন্ধেও এঁরা ছিলেন ওয়াকিফ্‌হাল। হায়দার আলী ও টিপু সুলতান দুজনেই নানা প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও প্রয়োগ ব্যাপারে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। মহীশূরের রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত যে বিপুল ও বিচিত্র আয়ুধ-প্রহরণের প্রদর্শনী দেখতে পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই হায়দর-টিপু সুলতানেরই সংগ্রহ। এঁরা দুজনেই অসমসাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা, তরবারি চালনায় ক্ষিপ্রহস্ত এবং সুকৌশলী সেনানায়ক ছিলেন। টিপু সুলতান কয়েকটি অভিনব

মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে। ব্যাঘ্র বাহিনী নামে টিপু সুলতানের যে একটি সুশিক্ষিত দেহরক্ষী বাহিনী ছিল, তারা যেমন ছিল দুঃসাহসী তেমনি দুর্বার-গতি। টিপুর সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষা করত একদল রণকুঞ্জর। কিন্তু বহুযুদ্ধজয়ী এই হস্তিবাহিনীই শেষে টিপুর চরম পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের শেষ যুদ্ধে—ইতিহাসে যাকে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ বলা হয়েছে, কোম্পানির পল্টনের গুলিবর্ষণে টিপুর আহত হাতিগুলি উন্মত্ত হয়ে স্বপক্ষীয় সৈন্যদলেরই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টিপুর পরিণাম বড়ই করুণ ও শোচনীয়। লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary alliance) গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনী টিপুর রাজ্য আক্রমণ করে। ইংরাজের আশ্রিত হায়দ্রাবাদের নিজাম কোম্পানিকে সক্রিয় সাহায্য দান করে। মারাঠা শক্তি বরাবরই টিপুর বিরোধী—তারা নিরপেক্ষ থাকে। বহুগুণ শক্তিশালী বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে টিপু সুরক্ষিত শ্রীরঙ্গমপত্তন দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ইংরাজ সৈন্য দুর্গ অবরোধ করে শেষ আক্রমণের অপেক্ষায় বসে রইল।

উপলব্যাথিতগতি কাবেরী নদী সাধারণতঃ ক্ষীণতোয়া কিন্তু বর্ষায় স্ফীতকায়া। কাবেরীর মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ, তারই উপর পাথরের তৈরী শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ। কঠিন ও সু-উচ্চ

পাথরের প্রাচীরে দুর্গের চারিদিক বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। দুর্গ-প্রাকারের চারিদিক ঘিরে কাবেরীর পরিখা। দুর্গপ্রাকারের বহিরাবরণের অভ্যন্তরেও প্রাচীরের আর একটি আবরণ। বহিপ্রাচীর ও অন্তপ্রাচীরের মধ্যস্থলে আবার এক সুগভীর পরিখা। আত্মরক্ষার পক্ষে দুর্গটি সুদৃঢ় ও নিরাপদ। দুর্গের দুই পার্শ্বে বহির্জগতের সহিত সংযোগকারী কাবেরী নদীর উপর দুইটি সেতু। এখন তার উপর দিয়ে ট্রেন যায়।

সুরক্ষিত শ্রীরঙ্গম দুর্গে টিপু সুলতান শেষ আশ্রয় নিয়ে অমিত বিক্রমে প্রতিরোধ ঠেকাতে লাগলেন। ক্রমে রসদ ফুরিয়ে এল। ওদিকে ইংরাজ সৈন্য কামান দাগিয়ে অনবরত দুর্গপ্রাকার ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই যখন টিপুর আত্মসমর্পণের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন ইংরাজ বাহিনী কেল্লা দখল করবার জন্য বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করল। স্বল্পতোয়া কাবেরী অতিক্রম করা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কিন্তু দুর্গপ্রাকার উল্লঙ্ঘন করাই শক্ত। ইংরাজের কামান যা করতে সফল হয় নি, খুব সম্ভবত কোন পঞ্চম বাহিনীভুক্ত ব্যক্তির সাহায্যে সে কাজ সহজসাধ্য হয়ে গেল। দুর্গের বহিরাবরণ ও অন্তরাবরণের মাঝখানের সুগভীর প্রাচীর অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল, এমন সময় দেখা গেল কে বা কারা এক জায়গায় দুই প্রাচীরের উপর কাঠের বল্লা পেতে অস্থায়ী সেতু তৈরী করে রেখেছে। সেই পথে অগণিত কোম্পানির পল্টন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল। দুর্গরক্ষীদল অমিতবিক্রমে

আক্রমণকারীদের বাধা দিতে লাগল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাধিক্যের ফলে সে বাধাদান ক্রমশই নিস্তেজ ও নিষ্ফল হয়ে আসতে লাগল। টিপু স্বয়ং রক্ষীদলের পুরোভাগে থেকে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বন্দুকের গুলিতে তিনি গুরুতররূপে আহত হয়ে ধরাশায়ী হন। তাঁর কটিদেশে ছিল একটি বহুমূল্য সোনার কোমরবন্ধ। টিপুকে আহত ও মরণোন্মুখ দেখে এক লোভী সৈনিক তাঁর কোমরবন্ধটি অপহরণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই ভূতলশায়ী অবস্থাতেই টিপু কোষ থেকে তরবারি টেনে নিয়ে অপহরণকারীর মস্তক দেহচ্যুত করে চৌর্যাপরাধের শাস্তি দেন। প্রচুর রক্তমোক্ষণের ফলে অচিরেই টিপুর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাঁর মৃতদেহ সেখানেই পড়ে থাকে। তাঁর দেহরক্ষী ও শিবিকাবাহকেরা অবস্থা বেগতিক দেখেই পালিয়ে যায়। ইংরাজ বাহিনী কেল্লা দখল করে নেয়। পরে খুঁজতে খুঁজতে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে টিপুর মৃতদেহটিও পাওয়া যায়। জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচরের চেষ্টায় টিপুকে তাঁর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনেই সমাধিস্থ করা হয়, শ্রীরঙ্গপত্তনে তাঁর সমাধি এখনও দেখা যায়। টিপুর গ্রীষ্মাবাসটি এখনও শ্রীরঙ্গপত্তনে রয়েছে—তা ছাড়া রয়েছে টিপু যেখানে প্রার্থনা করতেন সেই মস্‌জিদ। তাঁর বংশধর ও পরিবারের লোকেরা নির্বাসিত হলেন কলিকাতায়। কলিকাতার টালিগঞ্জে মহীশূরের নবাব বংশের কেউ কেউ এখনও আছেন। চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার সংযোগ স্থলে টিপু সুলতানের মস্‌জিদটিও সেই বিগতদিনের ঘটনার স্মারক।

প্রচলিত ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে এই আখ্যায়িকার একটু গরমিল থাকা অসম্ভব নয়, কারণ এই আখ্যানটির মূল ভিত্তি হচ্ছে মহীশূরে প্রচলিত জনপ্রবাদ। "টিপুস্থলতানের মৃত্যু" শীর্ষক যে তৈলচিত্রের অনুলিপি আমরা সচরাচর দেখি, তাতে দেখা যায়, শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গতোরণে মুমূর্ষু টিপু আর তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতি। বর্তমান আখ্যানে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে এই চিত্রের বিশেষ কোন মিল নেই।

বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাঁকে দস্যু বলে পরিহাস করেছে, তাঁকে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার তৌলে আমরা রাজর্ষির আসন দিয়েছি। ভারতবাসী ইতিহাস লিখত না, তাই পুরাতন ভারতের বহু মহাজনের চরিত্র ও কীর্তিকলাপ সহানুভূতিহীন বিদেশীয় ইতিহাসকারের হাতে বিকৃত ও বিবর্ণিত হয়েছে। টিপুকেও আমরা জানি অত্যাচারী ও ধর্মান্ধরূপে। সে অপবাদ আজ অনেকে খণ্ডন করেছেন। সেদিনকার সেই বহুধা বিভক্ত ভারতবর্ষে শক্তিশালী, কূটকৌশলী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে স্বীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে অস্বীকৃতিই টিপুর শোচনীয় পরিণামের কারণ। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা। ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠা এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে তিনি একক সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং প্রগতিশীল। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক গগনের নবোদিত সূর্য বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সুদূর তুরস্কের রাজদরবারে তিনি রাজদূত পাঠিয়েছিলেন।

সেদিনকার দিনে এ বড় কম কথা নয়। কিন্তু এই স্বাধীন বৈদেশিক নীতির জন্য টিপুকে ইংরাজের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গপত্তনেই ছিল টিপুর রাজধানী। এখানেই টিপুর রাজত্ব ও কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু আজও আছে। এখন আর শ্রীরঙ্গপত্তনের সেই পূর্ব গৌরব নেই। ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে পর্যটক-দলের কৌতূহল জাগায়। পুরাতন সৌধগুলির অবস্থা ক্রমশই কালের করস্পর্শে জীর্ণ হয়ে আসছে। টিপুর গ্রীষ্মাবাস 'দরিয়া দৌলত' প্রাসাদটি এখন 'টুরিস্ট বাংলো' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এখানে আছে এক অতি সুপ্রাচীন ও সুবিশাল হিন্দুমন্দির। কথিত আছে এই মন্দিরের নির্মাণ ও সংরক্ষণ অনেকাংশে টিপু সুলতানের অর্থানুকূল্যেই সম্ভব হয়েছিল। শ্রীরঙ্গপত্তন এখন একটা সামান্য রেলওয়ে স্টেশন, ব্যাঙ্গালোর হতে মহীশূর যেতে পথে পড়ে। মহীশূর থেকে এর দূরত্ব বেশী নয়— মাইল আট-নয় হবে। মহীশূর শহরেই মহারাজার প্রাসাদ, যদিও মহীশূর রাজ্যের রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র ব্যাঙ্গালোর। এ আমলের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র ব্যাঙ্গালোরেই কেন্দ্রীভূত। আধুনিক ইউরোপীয় স্টাইলের শহর ব্যাঙ্গালোর—সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘরবাড়ি সুরুচিসম্মত, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চলাফেরায় ইউরোপীয় বেশভূষা ও চালচলনের বিসদৃশ অনুকরণের প্রয়াস। স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে যেন এই অনুকরণপ্রিয়তা অতি উৎকটভাবে দেখা

২

দিয়েছে। এ বিষয়ে রাজধানী দিল্লি সকলের পুরোভাগে। সরকারী ও সওদাগরী আফিসগুলিতে, হোটেলে রেঁস্তোরায়, রাস্তায় ঘাটে সবাই যেন একটা উৎকট সাহেবিয়ানার পাল্লা দিচ্ছে। আজকাল আবার আফিসে আফিসে মেয়েরা নানা কাজে ঢুকছে। তাদের মেমসাহেবি আরও দৃষ্টিকটু। মেয়ে অফিসার হলে তো আর কথাই নেই। পিওন চাপরাশী তটস্থ, সম্বোধনে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি হবার জো নেই। আর তাদের বা দোষ কি? মেমসায়েব কথাটা তবু রপ্ত হয়ে গিয়েছে। দেশী ভাষায় ঠিক এইরূপ একটা 'সর্বরোগ ধন্বন্তরি' কথা আছে কি? কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির সর্বত্রই এই বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয়তা হালে খুব বেড়ে গিয়েছে। এগুলি খুব বড় জায়গা—নানা ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে এই অশোভন দৃশ্যগুলি চোখে পড়ে। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে সাধারণ ভোজনালয়ে ও পানাগারে যখন দেখা যায় ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা একই সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করছেন, তখন সত্যি মনে হয়, আমরা কি মারাত্মকভাবেই না প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি! ব্যাঙ্গালোরেই আছে বিখ্যাত 'সায়েন্স ইন্‌স্টিটিউট'। এখানে কর্মব্যপদেশে বহু বাঙালী বাস করেন এবং স্থানীয় বিদগ্ধমণ্ডলীতে এঁরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ব্যাঙ্গালোরের সহিত তুলনায় মহীশূর অনেকটা ছোট এবং নিষ্প্রভ। কিন্তু শহর হিসেবে মহীশূরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিন্যাস-পারিপাট্য দর্শনীয়। একদিন রাজপ্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম। ভারতীয় রাজন্যবর্গের ঐশ্বর্য

ও বিলাসোপকরণ-সংগ্রহ সর্বজনবিদিত। অনেকটা মধ্যযুগীয় অট্টালিকা। দেয়ালে দেয়ালে চকমকি কাচ ও মীনা বসানো। অজস্র ঝাড়লণ্ঠন—যদিও এখন বিজলীবাতির কল্যাণে সেগুলির আর ব্যবহার হয় না। দরবার-গৃহটি খুবই প্রশস্ত। উৎসবের দিনে সপারিষদ মহারাজা উপরের অলিন্দে উপবিষ্ট থাকেন, আর নীচ থেকে রাজহস্তী শুণ্ডদ্বারা সুগন্ধ কুসুমস্তবক নিক্ষেপ করে মহারাজাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। মধ্যযুগীয় ফিউডালিজম আজ অপগতপ্রায়। এই সেদিন পর্যন্তও ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষপুটাশ্রিত দেশীয় রাজন্যবর্গ ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের কত চমকপ্রদ বৈচিত্র্যই না দেখিয়েছেন। ইউরোপের সেরা সেরা হোটেল ও অবসরযাপনের স্থানগুলি এই ভারতীয় বিলাসীগণের অকৃপণ অর্থব্যয়ে পুষ্ট হয়েছে। সেই উদ্দাম বিলাসব্যসনের স্রোতে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও এখনও তার জের মিটতে দেরি আছে। এখন আবার রাজকীয় কৌলীন্যের বদলে আর এক নূতন কালোবাজারি কাঞ্চনকৌলীন্য নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। কালোবাজারি আঙুল-ফুলে কলাগাছ ধনী সম্প্রদায়ের নিষ্পেষণে সমস্ত সমাজদেহ ক্লিষ্ট ও জর্জরিত। আমাদের বড় বড় শহরগুলিতে এই নূতন বড়লোকদের ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গীয়ানা অধুনা খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে।

*   *   *   *

মহীশূরে একটা দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান সরকারী শিল্পশালা। চন্দন-কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজের জন্য এদেশ বিখ্যাত; সরকারী শিল্পশালায় অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস সংগৃহীত

আছে। ইচ্ছে করলে কিনতেও পারা যায়, অবশ্য ট্যাঁকে যথেষ্ট পয়সা থাকা চাই।

*　　　　　*　　　　　*

মহীশূর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে বন্দীপুরের রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বন একটা দেখবার মতো জিনিস। অবশ্য সেখানে যেতে হলে প্রথমতঃ চাই সরকারী ছাড়পত্র আর দ্বিতীয়তঃ চাই উপযুক্ত যানবাহন, আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র ও সঙ্গীসাথী। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগার ন্যাশানাল পার্ক, লণ্ডনের হুইপস্‌নেড আর আমাদের দেশে আসামের কাজিরঙ্গা রিজার্ভ ফরেস্ট ও পশুনিবাসের কথা আমরা অনেকেই জানি। বন্দীপুরের বনও সেই পর্যায়ে পড়ে। এক বিরাট ও গভীর বন। আরণ্য প্রকৃতির কোলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে নানা জীবজন্তু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আছে বাঘ, হাতি, বাইসন, নীলগাই, হরিণ, ময়ূর আর অসংখ্য শাখামৃগ। জীপগাড়ির সাহায্যে আমরা অরণ্যের গভীর অন্তঃপ্রদেশে ঢুকে পড়লাম। আরকাঠিয়া আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বন্ধুর, শিলাসঙ্কুল, লতাগুল্মাচ্ছাদিত বনপথ অতিক্রম করে জীপ চলতে লাগল। গভীর বনের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও দেখা যায় বাইসন যূথের নিরুদ্বেগ বিচরণ, কোথাও জীপের হুঙ্কারে ভীত, সচকিত হরিণদলের দিগ্বিদিক পলায়ন এবং বৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে সুদৃশ্য ময়ূরের নীলানর্তন ও পুচ্ছবিস্তার। এরাও মানুষের সংস্রব সর্বপ্রযত্নে পরিহার করে। অনভিপ্রেত আগন্তুকের আবির্ভাবে এদের সশব্দ ও সচিত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শন

দর্শনীয় বৈ কি। কোথাও বাঘ দেখতে পেলুম না, যদিও বাঘ শিকারের মাচা অনেক জায়গাতেই দেখা গেল এবং এবং কয়েকটি স্থানে জলাশয়ের ধারে বালুর উপর বাঘের থাবার দাগও সুস্পষ্ট। বন্দীপুর রিজার্ভ ফরেস্ট নীলগিরির বিস্তীর্ণ সানুদেশে জুড়ে বিস্তৃত। বনের মধ্যে বেশির ভাগই শাল, দেওদার ও শিশুগাছ এবং আরও নানা জাতীয় গাছপালার বিচিত্র সমাবেশ। কিন্তু সব গাছের পরিচয় জানতে হলে যে পরিমাণ বটানি-শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা দরকার, তার কিছুমাত্রও লেখকের নেই। কাজেই গাছপালার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ চাক্ষুষ সৌন্দর্যটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন আর উপায় কী? ঘন সন্নিবিষ্ট বেতস ও কীচক কুঞ্জেরই বা কী শোভা,—দিগন্তবিস্তৃত নিশ্ছিদ্র ও পুঞ্জীভূত অন্ধকার! এই দুর্ভেদ্য জমাট ঘনান্ধকার যেন সমগ্র বনভূমির রহস্যের মণিকোঠা। বেতের বন কুখ্যাত শার্দূলরাজের আবাসভূমি, আর বাঁশপাতার লোভে নীলগিরি পাহাড় হতে নেমে আসে বুনোহাতির দল। এদের দৌরাত্ম্যের চিহ্ন বহুস্থানেই সুস্পষ্ট। বৃক্ষরাজির মাথার উপর দিয়ে দেখা যায় দূরচক্রবাল-রেখা-সংলগ্ন নীলগিরির মেঘাবৃত শৈলচূড়া। আকাশ, অরণ্য ও শৈলশ্রেণী এই তিনের একান্ত মিলনে সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির এক নিরবদ্য রূপ। গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে যে এত শোভা লুকানো থাকে, বহির্দেশ হতে তা ঠিক বুঝা যায় না। জায়গায় জায়গায় বনফুলের মহোৎসব লেগে গিয়েছে। একরকম বড় বড় হলুদ ফুলে সমস্ত তরুশীর্ষ সমাচ্ছন্ন ফুলগুলি গন্ধবিহীন,

কিন্তু কী উজ্জ্বল তার রঙ—চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। গাছপালার বা কত বৈচিত্র্য! কত রকমারি গাছ ও লতা, কত বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন রঙের পাতা ও কত বিচিত্র বর্ণের ফুল! প্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে!

অরণ্য-পরিক্রমায় প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেল। জীপে চলেছি, মাঝে মাঝে জীপ থেকে নেমে পায়ে হাঁটাও চলেছে। কিন্তু বেশী দূর পায়ে হাঁটা বিপজ্জনক। দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী স্বচ্ছন্দ বিচরণ নিরাপত্তার দিক দিয়ে একেবারেই নিষিদ্ধ। তখন বিকাল হয়ে এসেছে। বেলা তিনটা নাগাদ হবে। বনভূমির রূপ ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। তরুগুল্মাচ্ছাদিত ছায়ানিবিড় বনভূমি এরি মধ্যে প্রায় ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে এল। পক্ষী-কাকলী ও ঝিল্লী-ঝননে কান পাতা দায়! আমাদেরও নিষ্ক্রমণের সময় হয়ে এল। এর পরে বনের মধ্যে থাকার আদেশ নেই, নিরাপদও নয়। এখনি শুরু হবে নানা শ্বাপদের নৈশাভিযান। অরণ্যের রহস্য যেমনি নিবিড় তেমনি নিষ্করুণ। আরকাঠিয়া আমাদের পথ দেখিয়ে বনের বাইরে নিয়ে এল। সারাদিনে প্রায় ষাট মাইল বনপথ অতিক্রম করেছি।

পুষ্কর তীর্থে

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং,
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।

ভুবনবিদিত পুষ্কর বংশে মেঘদূতের জন্ম। সলিলগর্ভ মেঘবিশেষের নাম পুষ্কর। পুরাণে এর উল্লেখ আছে—

পুষ্করা নাম ত মেঘাঃ
বৃহতস্তোয় মৎ সরাঃ।

ঊষর মরুময় রাজস্থানের বুকে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে পাহাড়-ঘেরা রমণীয় সরোবর। এমনি একটি রম্যস্থান বহু-বিশ্রুত পুষ্করতীর্থ—আজমীঢ় থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে। ভারতের প্রধান ও প্রাচীনতম তীর্থের অন্যতম এই পুষ্কর তীর্থ। কঠিন পাষাণের আলিঙ্গনে আবদ্ধা নীলসলিলা সরসী। তিন দিকে পাহাড়-ঘেরা আর এক দিকে জনপদ। পুষ্কর তীর্থের তীরে তীরে শ্বেত মর্মর মন্দির—রাজপুতনার রাজারা তৈরি করে দিয়েছেন। কোনটা জয়পুরের, কোনটা যোধপুরের, কোনটা বা বিকানীরের। স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জলে ছায়া পড়েছে আকাশবিহারী হালকা মেঘরাশির।

সে দিনটি ছিল চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল অথচ অনতিপূর্ব বর্ষণের প্রভাবে তাপহীন, স্নিগ্ধ। পুষ্করতীর্থের পরিবেশটি

পরম রমণীয়। অনতিদূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বিশ্রামকামী পুঞ্জমেঘ। এই মেঘরাশিই উদ্‌গামী হয়ে অন্তরীক্ষপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে—ঝরিয়ে দিবে শুষ্ক তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে শীতল জলধারা। শাস্ত্র যাই বলুক না কেন এমন মনোরম নীলসলিলা পুষ্কর সরসীই সেই "ধূমজ্যোতিসলিল-মরুতাং" মেঘরাশির যোগ্যা ধাত্রী। মহান পুষ্কর বংশে জন্ম পরিগ্রহ করাই মেঘদূতের পক্ষে শোভনীয়। মুক্তগতি কবি-কল্পনার আশ্রয়ে পুষ্কর সরোবর হতে উদ্ভূত হয়ে স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু-সমাচ্ছন্ন রামগিরির নির্বাসিত, বিরহী যক্ষের মনোবেদনার বার্তাবহ মেঘ ভারতপরিক্রমায় নির্গত হয়েছে—এ কথাটাই যেন সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্য বড় কম নয়। কার্তিক পূর্ণিমায় ভারতের নানা প্রান্ত হতে এখানে আসে পুণ্যলোভাতুর নরনারী—শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। ভারতের আর কোথাও প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজার প্রচলন নেই। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিন নিয়েই বিশ্বসত্তার উন্মেষ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমতুল্য। শাস্ত্রে তিনি পিতামহ রূপে কীর্তিত, ত্রিভুবনবন্দিত, সুরাসুরপূজিত। কিন্তু জনপ্রিয়তার তৌলে তিনি বিষ্ণু-মহেশ্বরের চাইতে অনেকখানি খাটো। ব্রহ্মার নামমহিমা শাস্ত্রগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। পুষ্কর ভিন্ন আর কোথাও ব্রহ্মা-পূজার প্রচলন দেখা যায় না। পুষ্করের ব্রহ্মা-মন্দির ভারতে অনন্য। ব্রহ্মা-মন্দিরের অদূরে শৈলচূড়ায় সাবিত্রী মন্দির। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্বসৃজনের সৌকর্যে যজ্ঞ-সম্পাদনে

নিযুক্ত। ধর্মাচরণে সহধর্মিণীর সাহচর্য চাই। ব্রহ্মার সহধর্মিণী সাবিত্রী দেবী। ইনি সত্যবান-পত্নী নহেন। ব্রহ্মা যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট—সাবিত্রী দেবীর প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। যজ্ঞের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হল, কিন্তু সাবিত্রী দেবীর দেখা নাই। আর সেই মুহূর্তেই সেখানে আবির্ভূতা হলেন এক সুন্দরী সুলক্ষণা গোপকন্যা। প্রজাপতি সেই গোপললনাকেই সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়ে নিজের বামে বসিয়ে নিলেন। যজ্ঞ শুরু হল। এমন সময় দেখা দিলেন সাবিত্রী দেবী। সতীন কাঁটা গোপকন্যা! নিদারুণ অভিমানে সাবিত্রী দেবী চলে গেলেন শৈলশিখরে। মানিনীর মান এখনও ভাঙে নি, তিনি তাই শিখরবাসিনী। পুষ্কর তীর্থের মাহাত্ম্য আকর্ষণ করে নিয়ে আসে দেশদেশান্তর হতে অগণিত পুণ্যকামী নরনারীকে। পুষ্কর হ্রদের জলে অবগাহন যে অতি. পুণ্যের কাজ! মন্দিরের চতুঃসীমায় জীবহিংসা নিষেধ। 'অহিংসা নীতির' দৌলতে আর কেউ না হোক—হ্রদের জলে মীনকূল পূর্ণ নিরাপত্তা উপভোগ করছে। ফলে কলেবর ও বংশবৃদ্ধি দুইই হয়েছে প্রচুর। দু-চার পয়সার ভুজা জলে ছড়িয়ে দিলেই হাজার হাজার মাছ কিলবিলিয়ে ঘাটের রানার কাছে ছুটে আসবে। তাদের পুচ্ছ-তাড়নায় হ্রদের স্তিমিত জল উদ্বেল হয়ে উঠে।

ভারতের অপরাপর হিন্দু-তীর্থের মতো পুষ্কর তীর্থেও পাণ্ডা-প্রভুরা রয়েছেন। কিন্তু এখানকার পাণ্ডাদের বেশ সংযত ও সৌজন্যশীল বলেই মনে হল। প্রথমটা নবাগন্তুক দেখে পাকড়াও করবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু দু-চার কথায়

অতি সহজেই তাদের প্রতিনিবৃত্ত করা গেল। তীর্থের পাণ্ডাদের নামে বহু দুর্নাম। তাদের জোর-জুলুম ও জবরদস্তির বহু কাহিনীই শুনতে পাওয়া যায়। গয়ার পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান (ভারত সেবাশ্রম সংঘ) বহু বৎসর পূর্বে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তীর্থযাত্রীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ করবার জন্য, এবং তাঁদের সে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল। আমার কিন্তু মনে হয় আজকের দিনে যখন ভারতে ট্যুরিজম বা দেশভ্রমণ জিনিসটাকে একটা সুপরিচালিত ট্রেড বা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে, তখন একশ্রেণীর সুশিক্ষিত গাইডেরও প্রয়োজন আছে। পাণ্ডারা আবহমান কাল ধরে ভারতের তীর্থে তীর্থে গাইডের কাজই করে এসেছে। শিক্ষা, দীক্ষা ও সুপরিচালনার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করে নি। অর্থলোলুপতা-বশতঃ তারা অনেক সময় নিরীহ তীর্থযাত্রীদের নিগ্রহ করেছে। পাণ্ডাদের নির্মম আচরণের প্রতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কঠোর ইঙ্গিত করেছেন: "লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।" আমার কিন্তু কোথাও এরূপ অভিজ্ঞতা হয় নি। ভারতের সবগুলি তীর্থে না গেলেও যেখানে যেখানে যাবার সুযোগ ঘটেছে, সেখানেই বরঞ্চ একটা জিনিস দেখে একটু অবাক না হয়ে পারি নি। এই স্বল্প-শিক্ষিত পাণ্ডার দল যেন ক্ষুদে ঐতিহাসিক। নাম, গোত্র বা পিতৃনাম—অতি সামান্য একটু সূত্র পেলেই হল—ঠিক খুঁজে বের করবে কবে কোন্

পূর্বপুরুষ কোন্ পাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই অজুহাতে দাবি করবে যাত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা। যতদিন ভারতে তীর্থ-মাহাত্ম্য থাকবে ততদিন পাণ্ডা-মাহাত্ম্যও থাকবে। কিন্তু সময়োপযোগী করে নিতে হবে পাণ্ডাবৃত্তিকে। তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও সুনিয়ন্ত্রণের।

*　　　　*　　　　*

পুষ্কর তীর্থ দর্শন শেষ করে এলাম আর এক তীর্থে। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর দরগাহ্। মুসলমানদের কাছে এর মাহাত্ম্য নাকি মক্কাশরিফের পরেই। আজমীঢ় শহরের এক প্রান্তে ঘিঞ্জি বস্তী, সঙ্কীর্ণ গলি, মানুষ-গোরুর ঘেষাঘেষি ও ঠেলাঠেলির মাঝে এই দরগাহ্।

পরিবেশটি আদৌ তীর্থস্থানের উপযোগী নয়। পুষ্কর তীর্থের স্নিগ্ধ ছোঁয়াচটুকু মন থেকে তখনও মুছে যায় নি। আজমীঢ় শরিফের হৈ হৈ হট্টগোলে মনটা যেন খিচিয়ে গেল। ভারতের হিন্দুতীর্থগুলির স্থান নির্বাচনের পিছনে রয়েছে শিব-সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ। কাশ্মীরের তুষার-তীর্থ অমরনাথ, হিমালয়শীর্ষস্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ, সমুদ্র-তীরবর্তী কন্যাকুমারী, পুরীধাম, সোমনাথ ইত্যাদি প্রত্যেকটি তীর্থ ই এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে মানুষ প্রকৃতির মহিমার মধ্য দিয়েই অপার্থিবের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুষমাই মানুষকে যুগে যুগে পরম রমণীয়ের সন্ধান দিয়েছে। ভারতের অগণিত বহুখ্যাত বা অল্পখ্যাত তীর্থে

তীর্থে যে তীর্থঙ্কর ঘুরে বেরিয়েছে সে-ই এ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করবে।

স্থান-মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে আজমীঢ় শরিফ অথবা খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর দরগাহের কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম না। যে নাতিউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে এখনও বীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের কেল্লার ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, তারই পাদদেশে এই দরগাহ্‌। সেরাসেনিক ও হিন্দুস্থাপত্যের সংমিশ্রণে মধ্য-যুগীয় ঐশ্লামী স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব। তাজমহল থেকে আরম্ভ করে উত্তর-বঙ্গের ছোট বড় মস্‌জিদ প্রভৃতির নির্মাণ-পদ্ধতি লক্ষ্য করলেই এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। বহু স্থানেই হিন্দু মন্দিরের ইট পাথর দিয়ে মস্‌জিদ তৈরী হয়েছিল। উত্তর-বঙ্গের বহু গ্রামে দেখেছি সে মসজিদের পাথরের সিঁড়ি রচিত হয়েছে শিব-মন্দিরের গৌরীপট্ট দিয়ে। এ সব পুরানো কথা নিয়ে মাতামাতি করার এখন আর কোনও সার্থকতা নেই। পুরানো ক্ষতস্থানে হাত দিতে নেই—তাতে ব্যথা আবার টনটন করে ওঠে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর বিখ্যাত দরগাহ্‌ কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। এখানে অবশ্যি আছে বড় বড় মিনার-ওয়ালা মসজিদ—একটা তৈরী করে দিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট আড়ম্বরপ্রিয় শাহ্‌জাহান, বলা বাহুল্য আগাগোড়াই শ্বেত পাথরের। আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও আড়ম্বরবর্জিত মস্‌জিদ সেটা ঔরংজীবের। যে ঔরংজীব বৃদ্ধ পিতাকে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিলেন,

তিনি কি পিতার মস্‌জিদে প্রার্থনা করবেন? তাই তাঁর একটি পৃথক মস্‌জিদ। দরগাহের প্রবেশ-তোরণটি বেশ জমকালো—তৈরী করে দিয়েছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর। সুপ্রশস্ত চত্বরে বহু দূরাগত মুসলমান নরনারী ইতস্তত বসে, শুয়ে বা ঘুমিয়ে রয়েছে। একজন গাইড উর্দু ভাষায় দরগাহের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিল। খাজা সাহেবের সমাধি-কক্ষে গেলাম—মাথায় একটা রুমাল বেঁধে—তাই নাকি রেওয়াজ। কয়েক জন বোরখাবৃতা মহিলা কবরের পাশে বসে প্রার্থনা করছিল। দরগাহের চত্বরের শেষ প্রান্তে পর্বত গাত্রসংলগ্ন এক কৃত্রিম জলাশয়। এই জলাশয় থেকেই পর্বতোপরি দুর্গবাসীগণের পানীয় জল সরবরাহ হত। শত্রুর আক্রমণে যাতে এই সংরক্ষিত জল বেহাত না হয়ে যায় তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত। এই দুর্গ ছিল দিল্লীর শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরাজ চৌহানের দুর্গ। একাদশ শতকের শেষ ভাগে চৌহান-বংশীয় পৃথ্বীরাজ, নামান্তরে রায় পৃথুরা তদানীন্তন ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের মধ্যে শৌর্যে, বীর্যে ও দেশাত্মবোধে ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। সেদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ দুর্যোগময়। হিন্দুকুশ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে শ্রাবণের ধারার মত অজস্র ধারায় এল রাজ্যলোভী দুর্ধর্ষ হানাদারের দল।

বীর পৃথ্বীরাজের আহ্বানের ভারতের নানা প্রান্ত হতে এল বীরের দল শত্রুকে প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। এলেন না পৃথ্বীরাজের সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী কান্যকুব্জরাজ গাহড়্‌বালবংশীয় জয়চাঁদ ও তাঁর অনুগামীরা।

প্রথম সংগ্রামে পৃথ্বীরাজের অমিত বিক্রমের কাছে আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর পরাভব ঘটে। বন্দী মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং আর ভারত আক্রমণ করবেন না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় মহানুভব পৃথ্বীরাজ তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেন। মহম্মদ ঘোরী কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। মরীয়া হয়ে পরাভবের গ্লানি মোচন করবার জন্য পর বৎসরই অধিকতর সৈন্যসামন্ত নিয়ে মহম্মদ আবার ভারত আক্রমণ করেন। তিরৌরীর প্রান্তরে আবার ভাগ্য পরীক্ষা হয়। ধূর্ত মহম্মদ ঘোরীর রণকৌশলে পরাজিত ও বন্দী হলেন পৃথ্বীরাজ। মহদাশয় পৃথ্বীরাজ যুদ্ধবন্দী মহম্মদ ঘোরীর প্রতি যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন—নিজে পেলেন তার বিপরীত ব্যবহার। নিষ্ঠুর, বিশ্বাসহন্তা মহম্মদ ঘোরী নির্মমভাবে হত্যা করলেন নিরস্ত্র বন্দী পৃথ্বীরাজকে। মহত্ত্বের কি নিদারুণ প্রতিদান! পৃথ্বীরাজের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাগ্যাকাশে নেমে এল প্রায় সহস্র বৎসরের নির্যাতন ও লাঞ্ছনা, —সে এক সকরুণ বেদনাময় কাহিনী।

*　　*　　*　　*

দরগাহ্ থেকে বেড়িয়ে এলাম একটু ভারী মন নিয়েই। প্রবেশ-তোরণের প্রায় সম্মুখেই এক দ্বিতল প্রাসাদ। এই প্রাসাদেই নাকি সম্রাট জাহাঙ্গীর আজমীঢ়ে এলে থাকতেন। এই প্রাসাদের অলিন্দে বসেই নাকি তিনি ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো'কে ভারতে ইংরাজ বণিকদিগকে বাণিজ্য করবার অনুমতি বা সনদ দিয়েছিলেন। সেদিন কি মুঘল সম্রাট

জাহাঙ্গীর ভেবে দেখেছিলেন যে একদিন "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।"

* * * *

ছোট্ট আজমীঢ় শহর—আগে ছিল আজমীঢ় রাজ্যের রাজধানী। রাজ্য ছোট হউক, বড় হউক তার রাজধানীর একটু জৌলুস থাকবেই। আজমীঢ়ও ছিল। এখন রাজপুতনার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে এক অখণ্ড রাজস্থান রাজ্য গঠিত হয়েছে। রাজধানী হয়েছে জয়পুর। রাজস্থানের ভারকেন্দ্র এখন জয়পুর।

উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ইত্যাদি প্রাক্তন রাজধানী শহরগুলির মতো আজমীঢ়ও আজকাল কিছুটা কোণঠাসা, অনাদৃত। শহরটি ছোট্ট হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্টেশন হতে প্রায় তিন মাইল দূরে নূতন প্রতিষ্ঠিত আদর্শনগর। এখানকার সরকারী অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী। আজমীঢ়ে তাঁরই সাদর আতিথ্য উপভোগ করলাম। তাঁরই প্রীতিপদ সাহচর্যে আজমীঢ়-পুষ্কর পরিদর্শন সমাপ্ত হল। রাত্রি নটায় আগ্রাগামী ট্রেন। সে গাড়িতেই ফিরবার কথা। বাসায় ফিরে ট্রেনের কথা ফোনে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল ট্রেন দুই ঘণ্টা লেট। কাজেই তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই! খেয়ে দেয়ে ধীরে সুস্থে রওনা হওয়া যাবে। সাবধানের মার নেই—অতি উত্তম নীতিবাক্য। নটা নাগাদ আবার ফোন করা হল। কী বিপদ, ফোনে উত্তর এল—ট্রেন তো এসে গেছে—স্টেশনে দাঁড়িয়ে—আধঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বে। মাথায় বাজ ভেঙে

পড়ল যেন ; কোন মতেই আধ ঘণ্টায় তিন মাইল পথ পাড়ি দেওয়া যাবে না। জীবনে কোনদিন ট্রেন ফেল করি নি। আজ এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"উদ্যোগিনাং......" আবার শাস্ত্রবাক্য। দেখাই যাক না কপাল ঠুকে! নিয়োগী মশায় ও আমি স্যুটকেশ আর বেডিং ঘাড়ে নিয়ে ছুটে বেড়িয়ে পড়লাম—যদি রাস্তায় কোন ট্যাক্সি পাই! ট্যাক্সি জুটল না—তবে জুটল একটা টোঙ্গা। বকশিস কবুল করে টোঙ্গাওয়ালাকে গাড়ি হাঁকাতে বলা হল, কিন্তু অশ্বপ্রবর প্রায় পক্ষীরাজেরই সমতুল। তিন কদম গিয়েই একটু জিরোয়। আর সারথীপ্রবর যত না গাড়ি চালাচ্ছেন তত চালাচ্ছেন মুখ। কিন্তু ঘোড়া নির্বিকার। ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক গাড়ি চলেছে—হিসেবমতো গেলে তিন মাইল পথ শেষ করতে পুরো দেড় ঘণ্টা লাগবেই। আমার মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়! মনে পড়ল বহুদিন আগের শোনা গানের একটা কলি "পাগলা মনটারে তুই বাঁধ"। মনটাকেই বেঁধে ফেললাম। গাড়ি পাই বা না পাই তাতে কি আসে যায়—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি!" কিন্তু নিয়োগী মশায় উদ্যোগী পুরুষ। বিশুদ্ধ হিন্দিতে চোখা চোখা বুলি দু-চারটে ছাড়লেন! আশু ফল কিছুটা পাওয়া গেল। ঘোড়া ও ঘোড়ার চালক উভয়েই যেন সচকিত হয়ে উঠল।

গাড়ির গতি বেশ বেড়ে গেল। প্রায় গলদঘর্ম অবস্থায় যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন দশটা বেজে গেছে। দূর থেকে

তাকিয়ে বোধ হল স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম একেবারে ফাঁকা—গাড়ির নাম-গন্ধও নেই। তবুও শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে! স্টেশনে গাড়ি এসে থামতেই একজন কুলি এসে মোট নামাল। তাকে জিজ্ঞাসা করায় বলল "আগ্রেবালা গাড়ি অভিতক্ ছায়।" জীবনে এতো অপ্রত্যাশিত আনন্দ কখনো পাই নি! শুনলাম গাড়ি তু-ঘণ্টা লেট—কথাটায় কোন ভুল নেই। তবে লেট হয়েছে আজমীঢ় স্টেশনে এসে। এইবার ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠে চেপে বসা গেল। গাড়ি ছাড়ল রাত্রি ১১টায়। অপস্রিয়মাণ মন্থরগতি গাড়ির জানালা দিয়ে অশোক নিয়োগী মহাশয়কে ধন্যবাদজ্ঞাপক অভিবাদন জানালাম। তিনিও স্মিতহাস্যে প্রত্যভিবাদন করলেন।

রমণীয় রাজস্থান

এ ভ্রমণ-কাহিনীর সার্থকতা কি? বহুবার বহুজন ইতিহাস-বিশ্রুত বীরভূমি রাজস্থানের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। নতুন কথা আমার আর কি বলবার আছে। নতুন ভঙ্গীতেই কি আর কিছু বলতে পারব? প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষে ও কথা বলার কায়দায় অনেক সময়ে পুরানো জিনিসও নতুন রূপে মানুষকে চমক লাগিয়ে দেয়। সেদিক দিয়েও কোন সুবিধা করতে পারব না। তবুও কেন এ কাহিনী লিখতে বসেছি!

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি মনে পড়ে। তাঁর কথাগুলি যথাযথ এখন স্মরণে আসছে না। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে: এই বৈচিত্র্যময় ভারতভূমিকে চিনতে হলে, জানতে হলে, ভারতের মর্মকথা উপলব্ধি করতে হলে পদব্রজে ধূলি-মৃত্তিকাময় ভারতভূমিকে পরিক্রমা করো। এ কথাটা যে কতদূর সত্য তা অনুভব করা যায় ঘর ছেড়ে এই সুপ্রাচীন ভারতভূমির বিরাট মুক্ত অঙ্গনতলে দাঁড়ালে। এই বিশাল বিচিত্র দেশ, এর অপরিসীম মহিমময় অতীত, এর নানা জাতি, নানা বেশ, নানা পরিধান এবং এর দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান —সব কিছু যেন মনকে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করে ফেলে। কী অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাবেশ এই ভারতভূমি! ধর্মপ্রাণতা,

বুজরুকি, ধনৈশ্বর্যের স্ফীতি ও নগ্নরূপ সকরুণ দারিদ্র্য, গগনস্পর্শী বাণীর দেউল ও অজ্ঞতা অশিক্ষার অতল অন্ধকার—সব কিছু মিলে যেন অনুভূতিপ্রবণ মনের তারে এক তীক্ষ্ণ অনুরণন জাগিয়ে তোলে।

আগ্রা থেকে গাড়ি ছাড়ল সন্ধ্যা ছটায়। জুন মাস। আগ্রা অবধি বৃষ্টির নামগন্ধও ছিল না। বাংলাদেশের শেষ-প্রান্ত চিত্তরঞ্জন ছাড়িয়েই শুরু হয়েছিল একটানা অসহ্য গরম। সাময়িক ছেদ পড়ল আগ্রায়। বিকেলে তাজমহল দেখতে গেলাম। কিন্তু ভাগ্যদোষে জ্যোৎস্নালোকে তাজমহল দেখা হল না। প্রবল বর্ষণের মধ্যে তাজমহলদর্শন শেষ করতে হল। চারদিক বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টিও বোধ হয় ঝাপসা, নইলে যে তাজমহল দেখতে ছুটে আসে বিশ্বের নরনারী, যে তাজমহল কতো কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করেছে, যে তাজমহলের কাহিনী নিয়ে কল্পনার কতো না জাল কতো জনে বুনেছে, সেই তাজমহল চাক্ষুষ দেখেও আমার মনে কিন্তু তেমন কোন উচ্ছ্বাস-স্পন্দন জাগল না। প্রথম যেদিন তাজমহল দেখি সেদিন যেমন তাকে আর দশটা বড়ো মসজিদের মতোই একটা মসজিদ মাত্র বলে ভুল করেছিলাম, আজও সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটল না। যমুনাব্রীজ স্টেশনে গাড়িতে বসেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি—দূরে একটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি। সহযাত্রী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কী দেখছেন, তাজমহল?" আমি জানতাম না ওই তাজমহল। প্রথম যেদিন সমুদ্রদর্শন করেছিলাম—মনে পড়ে হঠাৎ দালান-

কোঠা-দেওয়াল-ঘেরা মাদ্রাজ শহরের প্রান্তে সমুদ্রসৈকতে এসে মনে হয়েছিল যেন চোখের উপর থেকে একটা আবরণ খসে পড়ল। এক মুহূর্তে দিগন্তবিস্তার নীল সলিলরাশির শোভা সমস্ত সত্তাকে যেন বিলুপ্ত করে দিয়েছিল এক পরম রসঘন অনুভূতির আবেশে। কিন্তু কই, সেই বহুপ্রতীক্ষিত, বহু-কীর্তিত তাজমহল দেখে বিশেষ কোন বিস্ময় বা আবেগ অনুভব করতে পারলাম না কেন! সমুদ্রের সঙ্গে তাজমহলের তুলনা হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মানুষের হাতে গড়া কারুশিল্প—এরা হচ্ছে অসম বস্তু—দুয়ের মাঝে সারূপ্যের সূত্র খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু মানুষেরি হাতের রচনা অজন্তা-এলোরার পর্বত-খোদিত গুহা-গাত্রের অনবদ্য প্রাচীর-চিত্রগুলি আমার কাছে যে বিস্ময়ের বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, তাজমহল সে তুলনায় আমাকে অনেকখানি নিরাশ করল। তাজমহলের কুক্ষির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কক্ষে পাশাপাশি দুইটি সমাধি। সম্রাট শাহ্‌জাহান ও তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছে। সমাধি কক্ষটির দুইটি তলা। উভয় তলাতেই দুইটি সমাধি। গাইড বলল—নিচের তলার সমাধি দুইটিই আসল, আর উপরের দুইটি তারই পুনরনুকৃতি। সমাধির একটি ঠিক কক্ষের মধ্যস্থলে, অপরটি এক পাশে। দেখলেই বুঝা যায় দুইটির পাশাপাশি অবস্থান কক্ষটির সামঞ্জস্য হানি করেছে। প্রথমে কক্ষটির ঠিক মাঝখানে সমাহিত হয়েছিল মমতাজের নশ্বর দেহ। শাহ্‌জাহানের স্বপ্ন

ছিল প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিসৌধের অনুরূপ আর একটি সৌধ নির্মাণের—হয়তো যমুনার অপর তীরে, যেখানে সমাহিত করা হবে নিজের ভোগবিলাসজর্জরিত, দ্বেষহিংসাকণ্টকিত, শোক-তাপিত মর দেহটাকে।

কিন্তু সে সাধ তাঁর পূরণ হয় নি। তাঁর শেষ জীবন কেটেছে পুত্র ঔরঙ্গজীবের হুকুমে বন্দীদশায়। মনুষ্যত্বহীন নির্মমতার চরম প্রতিমূর্তি ঔরঙ্গজীব—অগ্রজ দারা-শুকোর ছিন্নমস্তক উপহার পাঠিয়েছিল বন্দী পিতার নিকট। আগ্রা দুর্গে বন্দী শাহ্‌জাহানের উদাস শূন্যদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত দূরে তাজমহলের দিকে। শেষ দীর্ঘনিশ্বাস মিলিয়ে গেল বাতাসের রোদনভরা হাহাকারে। কবির কল্পনায় তাজমহল শাহ্‌জাহানের অন্তরবেদনাকে চিরন্তন করে রাখবার প্রয়াস। তাজমহলের গর্ভ-কক্ষের ভিতর দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে শীর্ষ-গম্বুজের অভ্যন্তরটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। নীচে দাঁড়িয়ে জোরে হো-ও-ও-ও শব্দ করলে সেই শব্দ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে থাকে—বেশ খানিকক্ষণ ধরে একটা গুম গুম আওয়াজের রেশ বাজতে থাকে। বেশ লাগে এই ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ধ্বনির রেশটুকু।

আগ্রা থেকে আহমেদাবাদগামী গাড়িতে রওনা হলাম রাজস্থানের দিকে। গাড়িতে ন স্থানং তিলধারণম্। যে শ্রেণীর টিকিট ও স্থান সংরক্ষণের জন্য যথাবিধি মাশুল দিয়েছিলাম সে শ্রেণীর ধারেকাছেও ঘেঁষা গেল না। কারণ স্থানাভাব বা গাড়ির অভাব। স্টেশন কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়েও কিছু সুরাহা হল না। কর্তৃপক্ষ বললেন, "গাড়ির অভাব,

রিজার্ভেশন করা থাকলেও, কিছুই করা যাবে না। আপনি দরখাস্ত করুন, রিফণ্ড পাবেন।" যাওয়ার তাগিদ আমার, কাজেই জয়দুর্গা বলে একটা যে কোন শ্রেণীর কামরায় মাথা গলিয়ে দিলাম। সারা রাত একঠাঁয় নেহাত দাঁড়িয়ে নয়, বসে কাটাতে হবে। সান্ত্বনা এইটুকু, বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। রেলের কামরার ছাদের ফুটা দিয়ে বৃষ্টির জল ভিতরের আরোহীদিগের মাথার উপরেও বেশ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ভাল কথা, বৃষ্টির কল্যাণে গ্রীষ্মের তাপ হ্রাস পেয়েছে। কামরায় মানুষ আর মালপত্রের ঠাসাঠাসি গাদাগাদি, কিন্তু গরম নাই। এতো ভিড়েও নেহাত অসহ্য বোধ হচ্ছে না। রাতটা যাহোক একরকম কাটবে।

বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ গাড়ির ঝাঁকুনিতে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি গাড়ি এসে একটা ছোট্ট স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। নক্ষত্র-বিরল আকাশে লেগেছে রঙের ছোপ। গাড়ি বদল করলাম আজমীঢ়ে।

গাড়ি ছুটেছে রাজস্থানের দিগন্তবিসারী প্রান্তরের বুক চিরে। দিনের আলো ফুটে উঠল। কিন্তু কোথায় সে গতরাত্রের সুখ-স্পর্শ অকালবর্ষণ!

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উত্তাপও বাড়তে শুরু করেছে। দুপুরের দিকে চলন্ত ট্রেনের ভিতর তাপমাত্রা প্রায় অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ট্রেনের বাথরুমে দু-দুবার স্নান করে নিলাম। ট্যাঙ্কের জল প্রায় আধফুটন্ত, তবু স্নানের পর অল্প খানিকক্ষণ

একটু ঠাণ্ডা বোধ হয়। জানলা খড়খড়ি সব বন্ধ, একটি বাদে—কাচের সার্সি সব তোলা আছে। রুক্ষ ধূসর রাজস্থানের প্রান্তর,—রৌদ্রদগ্ধ দিনে তারও একটা রূপ আছে। মরুপ্রায় কাঁকর-বিছানো প্রান্তর—দিগন্তের শেষ সীমা অবধি—কোথাও ছেদ নাই। দূরে দূরে ধূসর পাহাড়। ফণিমনসা আর বাবলা ভিন্ন কোন উদ্ভিদ্‌ প্রায় চোখেই পড়ে না। তাও ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, এখানে ওখানে ছাড়া-ছাড়া।

শ্যামদর্শনা বঙ্গভূমির তুলনায় এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কতোই না তফাত! সমস্ত দেশটাই একান্ত জনবিরল। বহু দূরে দূরে জনপদ—অধিকাংশই দরিদ্র বস্তি। মাটি ও পাথরের তৈরি বাড়িঘরই বেশী। পাকা দালান-কোঠা যা কিছু শহরেই। গাঁয়ের বাড়িঘরগুলির গায়েই যেন দারিদ্র্যের ছাপ লেগে রয়েছে—ভাঙাচোরা এবড়ো-খেবড়ো। মানুষ, উট, ছাগল ও মহিষ সব যেন জড়াজড়ি করে রয়েছে একই প্রাঙ্গণে—কো-এক্‌জিস্‌টেন্‌সের কি চমৎকার দৃষ্টান্ত! ঘর-দোরগুলি যেমন শ্রীহীন তেমনি দীনতাচিহ্নিত। কিন্তু বাড়ি-ঘরের দশা যেমনি হোক না কেন, প্রায় প্রতিটি গৃহেরই আছে একটা বড় ফটক—মধ্যযুগীয় জমকালো দুর্গ-তোরণগুলির অনুকরণ। সেই বিগত সামন্ততান্ত্রিক যুগের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। রাজা-মহারাজা, সামন্ত-সর্দার হতে সাধারণ গ্রাম-বাসী পর্যন্ত সকলেরই পেশা ছিল অস্ত্রচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহ। গ্রামের গৃহস্থও ভূম্যধিকারী সর্দারের অনুকরণে একটা জমকালো গৃহতোরণ তৈরি করে আত্মতৃপ্তিলাভ করবে তাতে আশ্চর্য কি!

বহু মাইল পর পর স্টেশন। স্টেশনে স্টেশনে লোকজন, যাত্রীর ওঠানামা, ফেরিওয়ালার হাঁকডাক বেশ আছে। রাজস্থানীদের বেশভূষা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যারা আধুনিক তাদের কথা আলাদা—কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী—সর্বত্রই সেই একই ছাঁচের স্মার্ট পোশাক—ইজার, পায়জামা, আর হাওয়াই কোট। যুদ্ধের পর এর রেওয়াজটা খুব বেশী হয়েছে। অফিসে অফিসার ও কেরানী সবারই প্রায় ঐ এক ড্রেস। নেকটাই কোট প্রায় উঠেই গেল—গলাবন্ধ কোটের প্রচলনও বেশী হয় নি। ছাত্র, মাস্টার, দোকানদার ব্যবসাদার, ডাক্তার, দালাল প্রায় সবাই ঐ সহজ পোশাকটাকে গ্রহণ করেছে। আধুনিক মেয়েরা পরে হয় শাড়ি, নয় ঢিলা পাঞ্জাবি এবং সালোয়ার। এদের কথা বলছি না। বলছি দেহাতী রাজস্থানীদের কথা। পুরুষেরা পরে মালকোচা-মারা খাটো ধুতি, গায়ে একটা মেরজাই, আর মাথায় একটা দশা-সই পাগড়ি—মানুষটা না যতো বড় পাগড়িটা তার দেড়া। পাগড়ির নানা রঙ—সাদা, লাল, হলুদ। পায়ে নাগরা জুতা। প্রখর সূর্যতাপের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড পাগড়িটা যেন একটা তীব্র প্রতিবাদ। মেয়েদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের মতো খাপছাড়া নয়। সুন্দরী রমণীর গতিভঙ্গী নিয়ে কত কবিকল্পনাই না উৎসারিত হয়েছে। রাজস্থানী সুন্দরীদের সাজসজ্জার ছন্দ তাদের গতিচ্ছন্দের সঙ্গে একতালে বাঁধা। মেয়েদের পোশাক—ঘাঘরা, কাঁচুলি, আর ওড়না।

পায়ে পায়ে ঘাঘরা উঠে দুলে
ওড়না উড়ে দখিনা বাতাসে।

স্বাস্থ্যবতী যুবতীর স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীর তালে তালে রঙীন ঘাঘরার নৃত্যচাঞ্চল্য মুনিচিত্তকেও চঞ্চল করে তোলে। মাথার উপরে উপর্যুপরি তিন বা ততোধিক কুম্ভ,—চঞ্চলগতি রাজস্থানী ললনার দেখা পাওয়া যায় পল্লী-প্রান্তরে—পানিয়া ভরণে চলেছে গোরী। রাজস্থান নির্জলা দেশ। একফোঁটা জল এখানে পরম আদরের বস্তু। জনপদ অঞ্চলে স্বাভাবিক জলাশয়ের অভাব। মৃত্তিকার প্রস্তর-কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করে মানুষ বহু কষ্টে তার তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করে। পাতকূয়া পল্লীবাসীর একমাত্র সম্বল। পাহাড় অঞ্চলে কোথাও কোথাও ঝরনার জল মানুষের প্রয়োজন মেটায়। অনেক স্থলে দেখেছি বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়েছে খাদে বা গর্তে, ব্যবহার করা হয় কৃপণের ধনের মতো অতি সাবধানে। যুবতী নারী স্নান করছে তোলা জলে। এক ফোঁটা জলও যাতে অকারণে না নষ্ট হয়, তাই সে নগ্নিকা। দেহের প্রতি রন্ধ্র যেন প্রতি জলবিন্দুকে শোষণ করে নিচ্ছে।

উদয়পুরকে বলা হয় ভিনিস অব দি ইস্ট (Venice of the East)। হ্রদবেষ্টিত উদয়পুর। মেবারের শিশোদীয় বংশের মহারানাদের আদি রাজধানী চিতোর গড়। চিতোর দুর্গ অবস্থিত উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে এক নাতি-উচ্চ পাহাড়ের মালভূমিতে। রানা বাপ্পা রাওল, রানা কুম্ভ, রানা সংগ্রাম সিংহ প্রভৃতির রাজধানী ছিল চিতোর গড়েই। সামরিক নিরাপত্তার দিক দিয়ে চিতোর গড়ের অবস্থান

আদৌ সন্তোষজনক নয়। মুসলমান আমলে আলাউদ্দীন খিলজী হতে আকবর অবধি দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহেরা বারবার চিতোর অবরোধ করেছে, বারবার সমরানলে আত্মাহুতি দিয়েছে চিতোরের বীর যোদ্ধ্‌গণ, জহর ব্রতের জ্বলন্ত বহ্নিশিখা গ্রাস করে নিয়েছে রাজপুত-রমণীর রূপরাশি। ইট-পাথরের চিতোর নগরী শত্রু-কবলিতা হয়েছে বারবার, কিন্তু চিতোরের পুরনারীর দেহের শুচিতা কলঙ্কিত হয় নি কামোন্মত্ত আক্রমণকারীর আলিঙ্গনে।

মনে হয় প্রধানত সামরিক কারণেই চিতোর ছেড়ে নূতন রাজধানীর পত্তন করা হয়েছিল উদয়পুরে। চতুর্দিকেই পাহাড়ের বেষ্টনী। তিনটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ এই উপত্যকা প্রদেশকে বহির্জগতের সহিত যুক্ত করেছে। এই তিনটি পথ বন্ধ করে দিলেই উদয়পুর বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ-রহিত হয়ে যায়। সু-উচ্চ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর শিখরদেশ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, প্রায় অসম্ভব। সে দিক থেকে শত্রু-আক্রমণের আশঙ্কা বিশেষ নাই। এমন একটা নিরাপদ স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন রানা উদয় সিংহ। সংগ্রাম সিংহের পুত্র এবং প্রতাপ সিংহের পিতা উদয় সিংহের সামরিক ও শাসন-যোগ্যতার অপর কোন বিশেষ পরিচয় না পেলেও, রাজধানীর জন্য স্থান-নির্বাচন তাঁর দূরদর্শিতার নিদর্শন। চিতোর হারিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ মহারানা প্রতাপ তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি উদয়পুরের পাহাড়ের শীর্ষদেশেই অতিবাহিত করেছিলেন। অন্তিম শয়নে শায়িত প্রতাপ সিংহ সজল নেত্রে চেয়ে থাকতেন দূরে চিতোর-

গড়ের দুর্গস্তম্ভের দিকে। চিতোর-উদ্ধারের ব্যর্থতার বেদনা নিয়েই এই একনিষ্ঠ স্বাধীনতা-যোদ্ধা অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ এবং শহরের এক অংশ হ্রদের তীরে। পিচোলা হ্রদ আর ফতেসাগর হ্রদ—উভয়েই মানুষের কীর্তি। তিন দিকে পাহাড়—বৃষ্টির জল গড়িয়ে পাদদেশের নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হয়। অপর দিকের মুখ শক্ত কংক্রিটের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় যে কৌশলে ডুম্‌কা পাহাড়ের বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়েছে—ঠিক সেই কৌশলই অবলম্বিত হয়েছিল উদয়পুরের কৃত্রিম হ্রদগুলির বেলায়।

পিচোলা হ্রদের মাঝখানে দুটি রমণীয় মর্মর-প্রাসাদ—জগমন্দির ও জগমহল। হ্রদের তলদেশ থেকে পাথর গেঁথে তৈরি করা হয়েছে এই বাড়ি দুইটি, দেখায় যেন সরোবর-বক্ষে ভাসমান দুটি শুভ্র মরাল। উভয়ই প্রমোদগৃহ। জগমহলের সাজসজ্জা খুবই মহার্ঘ্য—নির্মাতাদের কল্পনা ও ভোগপ্রবণতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জগমন্দির প্রাসাদে জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিদ্রোহী পুত্র খুররম (পরে শাহ্‌জাহান) কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জগমহল প্রাসাদ হতে আধ মাইল দূরে হ্রদের প্রায় অপর প্রান্তে আর একটি ছোট্ট স্মৃতি-মন্দির দেখা যায়। এই স্মৃতি-মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক মর্মন্তুদ কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা-মহারাজার খেয়ালের অন্ত নাই। কোনও মহারাজার মজলিশে এক সুন্দরী নর্তকীর অপরূপ নৃত্যলীলা চলেছে। নর্তকীর বিলোল কটাক্ষে ও লীলায়িত

নৃত্যচ্ছন্দে সভাসদবৃন্দ বিহ্বল ও মোহাবিষ্ট। সবাই সুখ্যতি করল নর্তকীর লঘু ও চপল চরণক্ষেপের, নৃত্যকালীন দেহের ভারসাম্য রক্ষার অপূর্ব কৌশল। সার্কাসে রোপ-ওয়াকিং বা টানা রজ্জুর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার খেলা অনেকেই দেখেছি। নর্তকীকে ঐরূপ খেলা দেখাবার কথা বলা হল। মহারানা স্বয়ং ঘোষণা করলেন খুব মোটা বক্‌শিশ—প্রায় অর্ধেক রাজত্ব। নর্তকী মধুর হেসে সম্মতি জানাল। শর্ত হল জগমহল প্রাসাদের শীর্ষদেশ হতে রজ্জু টাঙিয়ে দেওয়া হবে হ্রদের দূরবর্তী তীর অবধি। সেই রজ্জুর উপর দিয়ে লঘু-পদক্ষেপে হেঁটে যাবে নর্তকী। নির্দিষ্ট দিনে এই দৃশ্য দেখবার জন্য রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল। অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত সেই দুঃসাহসিকা তরুণী শুরু করল তার বিচিত্র অভিযান। রুদ্ধনিশ্বাসে দর্শকবৃন্দ চেয়ে থাকল তার গমনপথের দিকে। পথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিন-চতুর্থাংশ পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এমন সময় অকস্মাৎ ছেদ পড়ল। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ঝটকায় রজ্জুর একপ্রান্ত কর্তিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুঃসাহসিকা মেয়েটির ঘটল অতর্কিত সলিল-সমাধি। মহারাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরই এক অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর করেছে এই দুষ্কর্ম। বহুলোকের চোখের সামনে ঘটল এই নিদারুণ ট্র্যাজেডি। হ্রদের যে স্থানটিতে ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা সেখানেই মহারানা তৈরী করে দিলেন এই ছোট্ট স্মৃতি-মন্দিরটি।

এককালে ভোগবিলাসের চূড়ান্ত আয়োজন ছিল জগমহল প্রাসাদে। এখনও তার অবশিষ্ট অনেক কিছু রয়েছে। পরি-

বেশটি সব সব রকমেই ভোগবিলাসের অনুকূল। মধ্যহ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে মর্মর সৌধের শ্বেতচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হ্রদের এক তীরে উদয়পুরের সুরম্য রাজপ্রাসাদশ্রেণী, হ্রদের তিনদিক পরিবেষ্টন করে রয়েছে ধূমেল শৈলমালা। মধ্যযুগে সারা ভারত যখন মোগলের প্রতাপে ক্লিষ্ট, পরাভূত—সেই সময়ে একমাত্র মেবারের রানারাই স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখতে পেরেছিলেন। উদয়পুরের প্রমোদ-প্রাসাদ মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েও এই নৃপতিবৃন্দ তাঁদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

ফতেসাগর সরোবরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—রানা ফতেসিং-এর কীর্তি বোধহয় অষ্টাদশ শতকে খনিত হয়েছিল। ফতেসাগরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তা মোটর-বিহারীদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয়। সারা মেবার রাজ্যেই হেথা হোথা ছড়িয়ে রয়েছে রমণীয় সরোবর। রাজসমুন্দ তেমনি আর একটি সুন্দর সরোবর, উদয়পুর হতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে। মহারানা রাজসিংহের কীর্তি।

যেদিন প্রথম প্রায় গোটা রাজস্থান পরিক্রমণ করে উদয়পুর এসে পৌঁছেছিলাম সে দিনটার কথা ভুলব না। উদয়পুরে ঢোকবার আগ পর্যন্ত গরমে অর্ধসিদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু উদয়পুরে এসেই তাপের পার্থক্য অনুভব করলাম। উদয়পুরের তাপ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—তার কারণ স্থানটির উচ্চতা এবং এর সরোবর-বেষ্টনী। যে রাত্রে পৌঁছলাম সে

রাত্রিতেই হল বেশ প্রবল বর্ষণ। যে কয়দিন ছিলাম প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু বৃষ্টি হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল প্রকৃতির রূপান্তর। রুক্ষ ধূমেল শৈলশ্রেণী দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ শ্যামদর্শন হয়ে উঠল। মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ বনভূমশ্যামস্তমাল-দ্রুমৈঃ। নগর-ভবনের উদ্যানগুলির মনোহরণ দৃশ্য। উদয়-পুরের যেন সে এক মনোহর অভিসারবেশ। সহেলীও-কি-বাগ অর্থাৎ সখী-কুঞ্জ সুন্দর সযত্নরক্ষিত উপবন—রাজান্তঃপুর-বাসিনীগণের বিহারভূমি। রাজস্থানের মরুভূমির মাঝখানে পাহাড়ঘেরা, হ্রদ-বিধৌত, উদ্যান-শোভিত উদয়পুর যেন একটি মরূদ্যান—ভারতের সুদৃশ্য নগরগুলির অন্যতম। দীর্ঘ পথ-পর্যটন সার্থক হল। যেদিন উদয়পুর হতে ফিরলাম বর্ষণ-স্নাত ধরণীর দিকে তাকিয়ে, দূরদিগন্তব্যাপী শ্যাম শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে, আকাশের মেঘসজ্জার সমারোহ দেখে নয়ন-মন পরম তৃপ্তিতে ভরে উঠল। বাংলার বর্ষা প্রাচুর্যের সমারোহে মহীয়ান। আর মরুভূমির বর্ষা কল্যাণী প্রকৃতির করুণাঘন রূপশ্রীর কী স্নিগ্ধ প্রকাশ!

অজন্তা-এলিফ্যাণ্টা।

"আমাদেরি কোন সপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়,
আমাদেরই পট অক্ষয় করি রেখেছে অজন্তায়।"

অজন্তা, অজন্তা—বহুশ্রুত নামটি! খুব ছেলেবেলা থেকেই নামটির সঙ্গে পরিচয়। চিত্রকলার উৎকর্ষ বোঝবার মতো বয়স তখনো হয় নি, আজও যে সে যোগ্যতা হয়েছে সে দাবি করবার ধৃষ্টতা রাখি না। কলারসিকও নই আমি। কিন্তু সেই ছেলেবেলাতেও বুঝতাম, আর এখনও বুঝি যে এই 'অজন্তা' নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতের এক গৌরবময় যুগের স্মৃতি।

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের ইতিহাসে কতোই না ঘটেছে অঘটন, কতোই না হয়েছে রক্তস্রাবী হানাহানি! আবার এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষ গড়ে তুলেছে উচ্চতর, মহত্তর জীবনের সৌধ। ধর্মই জুগিয়েছে উন্নতির অনুপ্রেরণা! যুগে যুগে খিন্ন, ক্লিষ্ট জীবনের পরাভব-গ্লানির ঊর্ধ্বে উঠেছে জীবনের জয়গান—ধর্মই জাগিয়ে তুলেছে নতুন ভাবের উদ্দীপনা।

বুদ্ধ-প্রবর্তিত অহিংসা ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতে ও বহির্বিশ্বে। আর সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই এসেছিল এত অভূতপূর্ব রেনেসাঁসের নতুন জোয়ার। ইতালীয় রেনে-

সাঁসের মতোই এই ভারতীয় রেনেসাঁসের ধারা ছিল বহুমুখী, স্পর্শ করেছিল জাতীয় জীবনের নানান দিক। সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নানা দিক দিয়েই রেনেসাঁস আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠেছিল। বাঙালী কবির দাবির কোন ইতিহাস-সিদ্ধ ভিত্তি আছে কিনা—আমার জানা নেই। অজন্তাগুহার চিত্রাবলীর স্রষ্টা সত্যই বাঙালী শিল্পী কিনা সে বিষয়ও প্রামাণ্য তথ্যের সন্ধান আমি পাই নি। রাজর্ষি অশোকের উদ্যমেই বৌদ্ধধর্মের দিক্-বিস্তার ঘটেছিল। বৌদ্ধ শ্রমণেরা ছিলেন একাধারে প্রচারক ও লোকশিক্ষক। তাঁরা জনপদে জনপদে বহন করে নিয়ে যেতেন ভগবান তথাগতের শান্তি-বাণী, মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন অষ্ট মার্গের তত্ত্ব এবং নিজেদেরই সংযত জীবনের আলোকসম্পাতে মানুষের সামনে তুলে ধরতেন এক উজ্জ্বল সামাজিক আদর্শ। ভারতের নানা পথে, প্রান্তরে, জনসমাগমস্থলে সম্রাট অশোক প্রস্তরস্তম্ভ ও শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন ধর্মোপদেশ ও নীতিবাক্য। লোক-শিক্ষার এতো বড়ো ব্যাপক অভিযান সে যুগের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। মনে হয় অজন্তার ২৫টি গুহা এবং পাঁচটি চৈত্য সম্বলিত যে বিরাট প্রতিষ্ঠানটি সে যুগে গড়ে উঠেছিল তা মূলতই ছিল একটি সজীব, ক্রিয়াচঞ্চল শিক্ষা-কেন্দ্র। এখানে দেখা যায় পর্বত-গুহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, শিলাসন, শিলাশয্যা, এমন কি শিলা-উপাধান। এই সব নিঃসজ্জা শিলা-প্রকোষ্ঠেই বাস করতেন ব্রতচারী শ্রমণের দল। কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁদের শিক্ষণের এক

প্রধান অঙ্গ। কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়েই তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতেন ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য। 'আজীবক' সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ শ্রমণরাই নাকি অজন্তা গুহার নির্মাতা ও অধিবাসী। বৌদ্ধশ্রমণগণের শিক্ষাপীঠ বা বিহারগুলি সেইকালে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডের নানা দেশ হতে আসত বিদ্যার্থীর দল, আসত তীর্থঙ্কর, আসত পরিব্রাজক। অন্য বৌদ্ধ বিহারগুলির সহিত অজন্তা বিহারের সে হিসাবে খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও, অজন্তার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। অজন্তা শুধু বিহার বা শিক্ষা-কেন্দ্রই ছিল তা নয়। ললিতকলার এতো বড় অনুশীলনকেন্দ্র সেদিনের ভারতে, আর সেদিনেরই বা বলি কেন, আজকের দিনেই বা কোথায় আছে? অজন্তা যেন সেই অতীত যুগে ভারতের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। লোকালয় হতে বহুদূরে, নিভৃতে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুধ্যানের পীঠরূপেই অজন্তার সৃষ্টি। দীর্ঘ-প্রসারিত অর্ধচন্দ্রাকার পর্বতের পার্শ্ব বিদারণ করে সারি সারি গুহা তৈরি করা হয়েছে। গুহাগুলি দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক-একটা বিরাট হলঘরের মতো। গুহাভ্যন্তরের সুমসৃণ পাষাণ-প্রাচীর ও ছাদের ফ্রেস্‌কোপেইন্টিং সারা জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সেই ছেলে-বেলায় দেখা 'প্রবাসী'র পাতায় ছাপা মা ও সন্তানের ছবি, বুদ্ধ ও রাহুলের ছবি, শাখামৃগের ছবি সবই এবার মৌলিক ও অবিকল দেখা গেল। অজন্তা গুহায় ভারতীয় ললিত-কলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন যে অজন্তাগুহার চিত্রাবলী—

সেই কথাটা চিত্ররসিক না হয়েও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধের জীবন, মায়া দেবীর স্বপ্নে শ্বেতহস্তী দর্শন ও লুম্বিনি উদ্যানে গৌতমের জন্ম হতে শুরু করে কুশীনগরে মহাভিনিষ্ক্রমণ অবধি বুদ্ধজীবনের প্রতিটি উল্লেখ্য ঘটনাই চিত্রিত রয়েছে পর্বতগাত্রে। জাতকের কাহিনীগুলি সূক্ষ্মতুলিকা-সম্পাতে রূপ পরিগ্রহ করেছে অপরূপ আলেখ্যে। দেড়হাজার বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে—কোথায় সেই বিগত-গৌরব বৌদ্ধযুগ—আর সেই লোক-শিক্ষক শ্রমণকুল! বিস্মৃতির অতলে সবই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে অজন্তার চিত্রাবলী। নিরেট পাষাণের গায়ে চুন-সুরকি-সিমেণ্ট ছাড়া এমন কি উপাদানের প্ল্যাস্টারিং লেপন করে নিয়ে তার উপরে রূপকার রঙ ও তুলির সাহায্যে এই অপূর্ব ছবিগুলি এঁকেছেন সে কথা আজও বিশেষজ্ঞদের কৌতূহলের কারণ। অনেকে বলেন যে, এই উপাদান ছিল অতি সহজলভ্য গোময়, যার সঙ্গে এমন একটা কিছু মশলা মিশিয়ে আটা তৈরি করা হয়েছিল, যে আটা হাজার বছরেও চটে যায় নি! আর রঙের স্থায়িত্বও কী অদ্ভুত! এতোদিনের আঁকা ছবি এতটুকু ম্লান হয় নি! অবশ্য সবগুলি গুহার ছবিই যে অটুট ও অক্ষত আছে তা নয়—কিন্তু সে ক্ষয় অনেকটা ঘটেছে অযত্নে ও অসাবধানী হাতের স্পর্শে। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ইতালীয় চিত্রকর নিযুক্ত করে ছবিগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এক অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির আশঙ্কা দূর করেছেন।

দীর্ঘ হাজার বৎসর অজন্তার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়েছিল। পরধর্মদ্বেষী ইসলামের আক্রমণে যে সময়ে হিন্দুর মঠ, মন্দির ও বৌদ্ধবিহারগুলি বিপন্ন সেই সময় সম্ভবত গুহাচিত্রগুলিকে চরম বিনষ্টির হাত হতে রক্ষাকল্পে অজন্তাবাসিগণ গুহামুখে পাথর চাপা দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল। মোট কথা হাজার বৎসর অজন্তা জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আত্মগোপন করে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পণ্ডিতপ্রবর ফাগুর্সন সাহেব ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জগৎসমীপে অজন্তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। কথিত আছে, দূর পাহাড়ের সানুদেশে একদল ইংরাজ সৈন্য ছাউনি ফেলে কুচকাওয়াজ করছিল, তারাই প্রথম সারিবদ্ধ গুহাগুলির সন্ধান পায়, এবং তারাই গাছপাথর সরিয়ে গুহামুখ মুক্ত করে।

অজন্তা ও এলোরা উভয়ই হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অবস্থিত। ঔরঙ্গাবাদ থেকে শ দেড়শ মাইল মোটর পরিক্রমায় এলোরা-অজন্তা উভয়ই এক যাত্রায় পরিদর্শন করা চলে। রাজ্য সরকার এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। বৎসরে পরিভ্রমণকারীর সংখ্যাও নেহাত কম হয় না, আর তাতে মুনাফাও বেশ হয়।

আমি অবশ্য ঔরঙ্গাবাদের পথে যাই নি। এলোরাও দেখা হয় নি। বোম্বাইগামী ট্রেন থেকে নামলাম জলগাঁও স্টেশনে। তখন ভোর হয় হয়। আর একজন মাত্র সহযাত্রীকে জলগাঁওয়ে নামতে দেখলাম। এঁর সঙ্গে পরে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, একই পথের পথিক, অর্থাৎ অজন্তাদর্শনাভিলাষী।

ভদ্রলোক অন্ধ্রদেশীয়, নাম শ্রীহরিনরোত্তম রাও। বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। দেহের বাঁধন বেশ পোক্ত, স্বাস্থ্যটি খুবই ভালো, এতোখানি বয়সেও যৌবনোচিত উৎসাহে ভরপুর। ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেছেন। বোম্বাই যাচ্ছিলেন নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করতে। পথিমধ্যে নেমে পড়েছেন জলগাঁওয়ে অজন্তাদর্শন মানসে। বেশ ভালো হল আমার পক্ষে, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

প্রাথমিক আলাপাদির পর স্ব স্ব পরিচয় দেওয়াই বিধি। রাও মশায় নিজেকে "অন্ধ্রা কেশরী" (Lion of Andhra) বলে পরিচয় দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিস্তি দিলেন তিনি কতগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত—একখানা ছাপানো লেটারহেড বের করে আমায় ভালো করে ওঁর পদবীগুলি অনুধাবন করতে বললেন। বুঝলাম বেশ একটু ইন্টারেস্টিং ধরনের লোক। একখানা ফুলস্কেপ শীট কাগজের প্রায় অর্ধাংশব্যাপী রাও মশায়ের নাম-ধাম-উপাধি-পদবী ইত্যাদির বহর। সবটা পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগল। দেখলাম রাও মশায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ী উপাধি বি. এ. অনার্স হাই সেকেণ্ড ক্লাস হতে শুরু করে প্রায় গোটা ছয়েক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের এক্স বা ভূতপূর্ব এবং বর্তমানে সাত-আটটা ঐ জাতীয় সংস্থার অ্যাক্টিং ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জয়েন্ট সেক্রেটারি, অনরারি ট্রেজারার ইত্যাদি, এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-প্রযুক্ত ঐরূপ আরও চার-পাঁচটা পদবীর লেজুড় জুড়ে দিয়ে এক মহামারী কাণ্ড! আগামী নিখিলভারত শিক্ষা-সম্মেলনে পদাধিকার-

বলে কার্যকরী সমিতির সদস্য, সর্বশেষে তারও উল্লেখ ছিল। এতো বড়ো ফিরিস্তিরচনা বেশ ধৈর্যসাপেক্ষ।

রাও মশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, লেটারহেডটি বুঝি সম্প্রতি ছাপিয়েছেন? অনেকটা তাচ্ছিল্যমিশ্রিতস্বরে বললেন, "An admirer got it printed for me।" বলা বাহুল্য রাও মশায়ের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলল। আমার পরিচয় শুনে অনুকম্পাজ্ঞাপক উক্তি করলেন, "Poor government servants! They have yet to know many things. It is good you have come to see Ajanta।" রাও মশায়ের এই নির্লজ্জ মোড়লির আরও প্রমাণ পরে পেয়েছিলাম।

যা হোক, এই আলাপ-আলোচনা আর বেশীদূর চালানো নিরর্থক ভেবে আসল কাজ, অর্থাৎ অজন্তা যাওয়ার উপায় দেখতে লাগলাম। জলগাঁও শহর থেকে বাস যায় অজন্তা অবধি, যথেষ্টসংখ্যক যাত্রী পেলে পর। যথেষ্টসংখ্যক যাত্রীর অপেক্ষা করতে হবে অনেক বেলা পর্যন্ত। আমার সময় সঙ্কীর্ণ। অজন্তা দেখা শেষ করে আবার বৈকালে বোম্বাইগামী গাড়ি ধরতে হবে। খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর একদল ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষাৎ মিলল। এরা এসেছে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অজন্তা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। পূর্বদিন এসে জলগাঁও শহরে এক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল। এক হাফ-টন স্টেশন-ওয়াগনের সন্ধানও মিলল। অজন্তা যাতায়াতে ত্রিশ টাকা দাবি করল। জলগাঁও থেকে অজন্তা ছত্রিশ মাইল।

দর কষাকষি চলল খানিকক্ষণ। রাও মশায় তুরীয় ভাব অবলম্বন করে রইলেন। শেষটায় রফা হল পঁচিশ টাকায়। আমারি গরজ বেশী, আমি দশ টাকা দিতে রাজী হলুম, ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যায় আটজন—ওরা বাকিটা চাঁদা করে দেবে। রাও মশায় চুপচাপ। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার সময় দেখা গেল তিনি বিনা আড়ম্বরে সম্মুখের ভালো আসনটি অধিকার করে বসে আছেন, যেন এটাই তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। পরেও একাধিকবার দেখেছি কাজের সময় রাও মশায়ের দেখা নাই, কিন্তু গ্রুপ-ফটো তোলবার সময় ঠিক সামনের সারিতে মধ্য-আসনটি তাঁরই অধিকারে। দু-চারটা মিটিংএ হরিনরোত্তম রাও মশায়ের সঙ্গে যোগদান করেছি। সভার পুরোভাগে সভাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য নির্ধারিত মঞ্চাসন। আমরা সভাপতির মঞ্চের নিচে সাধারণ আসনে বসে আছি। রাও মশায় উশখুশ করছেন, আর অনবরতই যতো বাজে কথা নিয়ে ভারি মাতামাতি করছেন, সভার কাজে বেশ বিঘ্ন ঘটছে। পরে কেউ হয়তো রাও মশায়কে লক্ষ্য করে "আরে আরে আপনি এখানে! আসুন, আসুন" ইত্যাদি বলে সভাপতির মঞ্চে তাঁকে বসিয়ে দিলেন—বাস সব চুপ—রাও মশায় একেবারে ঠাণ্ডা—আর তাঁর কোনো অভিযোগ নাই। পরে দু-চারটে মিটিংএর উদ্যোক্তাদের কানে কানে এই গোপন কথাটা বলে আমি তাঁদের আগেই সাবধান করে দিয়েছি। এই হচ্ছে রাও মশায়কে শান্ত রাখবার অমোঘ ওষুধ। তিনি চান খাতির বা প্রমিনেন্স। ভদ্রলোকের আরও একটা

বাতিক লক্ষ্য করলাম। কথায় কথায় খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তুইতোকারি বন্ধুত্বের উল্লেখ করা। বর্তমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর কাছে নেহাত ছেলে ছোকরা? টেগোর, অরবিন্দ, গান্ধী—হ্যাঁ এঁরা অন্তরঙ্গ ছিলেন বটে রাও মশায়ের, তবে এঁদের কারুর সঙ্গেই তাঁর মত মিলত না। শ্রীঅরবিন্দ নাকি হরিনরোত্তমকে বলেছিলেন: "You take charge of the political front, let me be on the spiritual side" এ জাতীয় বুলি কপচাতে ভদ্রলোক ওস্তাদ। আর এক মুদ্রাদোষ হচ্ছে কথায় কথায় বারো শ, পনর শ, দু হাজার, আড়াই হাজার ইত্যাদি অঙ্ক বলে যাওয়া। তাঁর অমুক আত্মীয়, শ্রীনাগরাজম—এইটিন হান্‌ড্রেড, শিবশেখরম—টু থাউজেণ্ড, অবিনাশলিঙ্গম—টু থাউ-জেণ্ড ফাইভ্‌ হান্‌ড্রেড—অনর্গল এই ভাবে নামের সঙ্গে মোটা অঙ্ক যুক্ত করে কথা বলে যাচ্ছেন। প্রথমটা বুঝতে পারি নি ব্যাপারখানা কি? একটু ভয়ে ভয়েই একবার এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক মুখব্যাদান করে যে ব্যাখ্যা দিলেন তাতে থ খেয়ে গেলাম। ঐ অঙ্কগুলি হচ্ছে লোক-বিশেষের মাসিক বেতন। অর্থাৎ বেতনের পরিমাণ দিয়েই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব ইত্যাদি আঁচ করে নিতে হবে। মানুষের পরিচয় দেবার কী অভিনব পন্থা! কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিনে এর চাইতে আর বড় পরিচয় কী থাকতে পারে।

যাক রাওমশায়কে সঙ্গে নিয়ে তো বেরিয়ে পড়া গেল।

যথাসময়েই অজন্তায় পৌঁছলাম। অনেকগুলি গুহা আর অজস্র চিত্র। সবগুলি বেশ ভালো ভাবে বুঝেসুঝে দেখতে গেলে একদিনে হয় না। দিনকয়েক হলে ভালো হয়। তা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আরও বহু ব্যস্তবাগীশ ট্যুরিস্ট জুটেছে—জনকয়েক আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা। এঁরা যা দেখছেন তাতেই বলছেন 'splendid' অথবা 'wonderful', গাইডরাও বেশ ফলাও করে অনেক কাল্পনিক কাহিনী তোতাপাখির মতো বলে যাচ্ছে—মোটা বকশিশের আশ্বাসে। এদিকে রাওমশায়কে নিয়ে আর-এক বিপদ। তাঁর পেয়েছে দুর্নিবার কফির তেষ্টা। অথচ ধারে-কাছে কফির নামগন্ধও নেই। রাওমশায় ভারী বিরক্ত। অজন্তা দেখতে কেন যে মানুষ আসে, সেই প্রশ্নই তিনি বারবার করতে লাগলেন। তিনি কেন এলেন ? "The fools have bluffed me"। অর্থাৎ, কফি না পাওয়া পর্যন্ত রাওমহাশয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না।

এদিক রাওএর দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অন্য সহযাত্রীদের দিকে ততোটা নজর দিতে পারি নি। পাঁচজন তরুণ আর তিনজন তরুণী এই নিয়েই ছাত্র-ছাত্রীর দল। তরুণী তিনটির মধ্যে শ্রীমতী কম্‌লা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুরূপা, সুবেশা তরুণী। বেশভূষায় উগ্র আধুনিকতার ছাপ। কথা-বার্তায় খুবই স্মার্ট। মহীন্দ্‌ আর কম্‌লা যুগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে —অন্য সকলের থেকে একটু আলাদা। মহীন্দ্‌ প্রাণপণে কম্‌লাকে খুশী করবার চেষ্টা করছে। কোথা থেকে এক কাপ

হুষ্প্রাপ্য চা নিয়ে এল, রোদ উঠেছে প্রচণ্ড—গুহার বাইরে যেন আগুন ছুটছে—মহীন্দ্‌ এগিয়ে এসে কম্‌লার মাথায় ছাতি ধরল। সাথে আছে ক্যামেরা—যার হুই তিন ফটো তোলাও হল। কম্‌লাও বেশ সুচতুরা ফ্লার্ট—অপাঙ্গ দৃষ্টি আর উচ্ছল হাসিতে মহীন্দ্‌ বেচারাকে জর্জরিত করে তুলেছে।

আমাদের অজন্তা পরিক্রমা শেষ হতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সকলেই কাতর। রাও মশায় ফিউরিয়স।

বেলা তখন প্রায় একটা। আবার ছত্রিশ মাইল দূরে জল-গাঁও না ফিরে গেলে আহার মিলবে না! মহীন্দ্‌ ও কম্‌লার উচ্ছলতাও যেন কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এমন সময় আকস্মিকভাবে দেখা দিলেন এক দ্বিতীয় পুরুষ—কম্‌লার পূর্ব-পরিচিত বন্ধু জীওনলাল। বেশ শাঁসালো যুবক—নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছে। কম্‌লার ভাবান্তর ঘটতে দেরি হল না। কম্‌লা ফিরে যাবে জীওনলালের গাড়িতে, জীওনলালের পাশেই বসে। বেচারা মহীন্দ্‌ আশা করেছিল অন্তত তাকে জীওন-লালের গাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে কম্‌লা। কিন্তু হায়, জীওনলালের গাড়ি ধূলির ঝড় উঠিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির আবছায়ায় বেচারা মহীন্দের মুখখানা বড়ই আশাহত ও করুণ দেখাচ্ছিল! নারীচরিত্র সত্যই হুজ্ঞেয়!

অজন্তার স্মৃতি তখনো তাজা। বোম্বাই থেকে মাত্র মাইল ১০।১২ দূরে সমুদ্রের বুকে ছোট্ট এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ। দ্বীপের প্রবেশমুখেই এক বৃহদাকার শিলাময় গজমূর্তি। সেই থেকেই

দ্বীপের নাম এলিফ্যাণ্টা। ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে মনে হয় গুপ্তযুগীয়। নিরেট পাহাড়ের গাত্রদেশ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে বিরাট বিরাট মূর্তি। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ বোম্বাইয়ের উপকূল হতে স্টীমলঞ্চে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরব সাগরের মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ শ্যামশোভায় সুদর্শন। মাথার উপরে ভাদ্রমাসের সূর্যের প্রচণ্ড প্রতাপ। মৃদু তরঙ্গাঘাতে সমুদ্রের জল ঈষৎ আন্দোলিত। বিচিত্র বীচিভঙ্গে সূর্যকিরণের ঝিকিমিকি। অজস্র মৎস্যলোভী সী-গাল পক্ষীর অবাধ সঞ্চরণ। ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি ক্রুজার মহড়ায় রত। বহু বিদেশগামী জাহাজের ইতস্তত আনাগোনা, আর সমুদ্রবক্ষে ভাসমান অসংখ্য আরবীয় ঢাও (Dhow)। বাহির দরিয়া হতে পেছন ফিরে বোম্বাই উপকূলের দৃশ্যটি দেখবার মতো। অ্যাপোলো বন্দর, ম্যারিন ড্রাইভ এবং আরও দূরে বোম্বাইয়ের অভিজাত অঞ্চল মালাবার হিলস্—এই অবিচ্ছিন্ন তটরেখা যেন ব্যগ্র দুবাহু প্রসারিত করে অসীমকে সীমার বাঁধনে বন্ধন করবার স্পর্ধা প্রকাশ করছে। সংক্ষিপ্ত হলেও এই সমুদ্রভ্রমণটুকু বেশ উপভোগ্য।

এলিফ্যাণ্টা দ্বীপও অজন্তা গুহার মতোই বহুদিনের বিস্মৃতির পর আবার মানুষের জ্ঞানগোচরীভূত হয়েছে। বিদেশী পর্তুগীজেরা প্রথম এই দ্বীপটিকে আবিষ্কার করে। পর্তুগীজেরা এখানে সুটিং-প্র্যাক্‌টিস করত—এলিফ্যাণ্টার শিলামূর্তির ভগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের সেই দুষ্ক্রিয়ার নিদর্শন আজও বহন করছে।

রামগিরি ও নর্মদা

নাগপুর শহর থেকে ছ্যাকড়া বাসে ত্রিশ মাইল ধূলিধূসর পথ অতিক্রম করে যে জায়গায়টায় এলাম তার নাম আর যাই হোক না কেন, কালিদাসের কাব্য-বর্ণিত ছায়াতরুস্নিগ্ধ "রামগিরি আশ্রম" বলতে কুণ্ঠা বোধ করি। মহাকবির কল্পলোক রামগিরির সঙ্গে বর্তমান রামটেকের মিল খুঁজে বার করা বড় সহজ কথা নয়! নাতিবৃহৎ একটা টিলার মতো পাহাড়— তারই শীর্ষদেশে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মন্দির। মন্দিরগুলির কারুকার্য তেমন উল্লেখ্য কিছু নয়, বরঞ্চ প্রাচীন ও সংস্কারের অভাবে জৌলুসহীন। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ প্রায় আলোবাতাসহীন অন্ধকার। মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সিঁদুরলিপ্ত বিগ্রহের দেহাংশ বিশেষ মাত্র চোখে পড়ে। এই কি সেই রামগিরি—নির্বাসিত বিরহী যক্ষ বেচারার আন্দামান? গাইড মহাশয় সোৎসাহে বলে উঠলেন 'অলবৎ, জরুর'।

* * *

আমার গাইড দুজন বেশ ইন্‌টারেস্টিং ধরনের। এঁদের সাথে পরিচয় হয়েছিল নাগপুরের কন্‌ফারেন্সে—শ্রী জি. ডি. কুলকার্ণি ও শ্রীমতী কুন্তলা। পুনা থেকে নাগপুর কন্‌-ফারেন্সে এসেছে। কুলকার্ণি আসলে কী করে জানা নেই,

আপাতত যা দেখলাম সেটা হচ্ছে শখের ফটোগ্রাফি। চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা একটা দামী ক্যামেরা সর্বদাই ঘাড়ে ঝুলছে। দিনে অসংখ্যবার নানা জনের নানা পোজের ছবি তুলছে। আমি বলেছিলাম "A costly hobby"। উত্তর পেলাম, "You will get copies, sure"। পাই নি অবশ্যি একটিও। হাসিখুশি আমুদে লোক—taking things easy।

শ্রীমতী কুন্তলা আধুনিকা তরুণী, পুনায় কোন কলেজের নবনিযুক্তা অধ্যাপিকা। কুলকার্ণি আর কুন্তলার পরস্পরের প্রকৃত বা প্রস্তাবিত সম্বন্ধ নির্ণয়ের কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় নি। নিবিড় সখ্য-সূত্রে উভয়ে আবদ্ধ। কন্‌ফারেন্সের কটা দিন, আর তার পরেও তাঁদের সাহচর্যে থেকে সে বিষয়ে ভুল করবার কোন কারণ ঘটে নি। এই আপাত নিবিড় বন্ধুত্বের নিবিড়তম পরিণতি—পরিণয়ের সম্ভাব্যতা কতদূর—সে বিষয়েও কোন প্রশ্ন করি নি, কারণ সেটা নেহাত ভালগ্যার বা স্থূল মনে হতে পারে! কুন্তলা প্রাণোচ্ছলা, কলহাসিনী। কুলকার্ণির ক্যামেরা সর্বদাই ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দে snap নিচ্ছে, আর কুন্তলার ফিকফিক হাসি কারণে অকারণে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ নিয়ে কটা দিন এদের সঙ্গে ছিলাম বেশ। এরাই গরজ করে নাগপুর থেকে রামটেক, সেবাগ্রাম এবং আরও দূরে জব্বলপুর-নর্মদা দেখিয়ে আনল। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

*　　*　　*　　*

বেলা দুটা নাগাদ রামটেক বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছুলাম।

বেশ তৃষ্ণা পেয়েছে। দেখি বেশ বড় বড় ডাঁশা পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে। তাই কতকগুলি কিনে নিলাম। তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে বেশ ভালো। কুলকার্ণি ও কুন্তলাকে ভাগ দিলাম। তারপর রামটেক পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। উদ্গমনপথের দুধারে ফুটে আছে অজস্র কুর্চিফুল।

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥

রামগিরির সানুদেশাশ্লিষ্ট পুঞ্জমেঘের সংবর্ধনায় বিরহী যক্ষ এই কুর্চিফুল দিয়েই অর্ঘ্য রচনা করেছিল। কবিবর্ণিত কুটজ কুসুম আর কুর্চিফুল বোধ হয় একই জিনিস। যা হোক কল্পনা আর বাস্তবের একটা মিল পাওয়া গেল! একটা গুলঞ্চের ভাঙা ডালের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পর্বতারোহণ করলাম। মাথার উপর খর রৌদ্র। দগ্ধ তামাটে রঙের আকাশ।, গরমে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি আর ভাবছি, কোথায় সেই স্নিগ্ধ সজল মেঘ!

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

নব বর্ষার নীল নীরদমালার সুখ-দর্শনেই প্রিয়া-বিরহ উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কবি নিশ্চয়ই এমন তাপদগ্ধ ক্লান্তিকর দিনে বিরহপ্রেম-কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন নি!

রামটেক পাহাড়কে মেঘদূতের রামগিরি বলে মেনে নিলে বাস্তবের অপূর্ণতা অনেকখানিই কল্পনার সাহায্যে পূরণ করে নিতে হবে। কালিদাসের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মল্লিনাথ

রামগিরিকে রামায়ণোক্ত চিত্রকূট পর্বতেরই নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন।

রামটেকের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত অধ্যাপক উইলসন সাহেব।

মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রস্তরসমাকীর্ণ। মোট চারিটি মন্দির। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের। পুরাণ কাহিনী-গুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি দেখা যায়। পিতৃসত্যপালক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আরণ্য-প্রবাসের কিছু অংশ এই রামগিরির শিখরদেশেই যাপন করেছিলেন।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু।

পাহাড়ের উপরেও আছে একটি অগভীর জলকূপ। গাইড-যুগল শ্রীমান কুলকার্ণি ও শ্রীমতী কুন্তলা খুব ওয়াকিফহাল—ইতোপূর্বেও তাঁদের একবার রামগিরি পরিদর্শন হয়ে গেছে। কাজেই স্থানমাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ। জলকূপটি-ই হল তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ—direct evidence। এরই জল সাধ্বী সীতাদেবীর বরতনুর স্পর্শে পবিত্রীকৃত। রামটেকের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার গরজ যেন কুন্তলারই বেশী। শ্রীমান কুলকার্ণি তাঁর ক্যামেরা নিয়েই ব্যস্ত। কুন্তলাকে রহস্য করে বললাম, মনে হচ্ছে প্রাচীন ও অর্বাচীনের তুমি একটি মজাদার সিন্-থেসিস্। একদিকে রামটেকের ঐতিহ্য প্রমাণ করবার ব্যাকুল প্রয়াস, আর অন্যদিকে তাঁর চালচলন মায় বেশভূষার বিচিত্র বাহার! শ্রীমতী কুন্তলা এসেছেন গাঢ় নীল শ্লেক্স্ (slacks) ও দুগ্ধ-শুভ্র জ্যাকেট পরিহিতা হয়ে। স্বাস্থ্যবতী

মেয়েটিকে এই অনুকৃত মেমসাহেবী পোশাকেও মন্দ দেখাচ্ছিল না। আমার মন্তব্যটি তাঁর আদৌ ভালো লাগল কিনা জানি না, মুখে অবশ্য বলল, 'সুক্রিয়া' (ধন্যবাদ)।

আমাদের রামগিরি-দর্শন শেষ হয়ে এল। রামটেকের অবস্থান ও পরিবেশ দেখে "মেঘদূতের" পূর্বমেঘের আশ্রয়স্থল রূপে একে কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু কবি-কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ অব্যাহত থাকুক। এক্ষেত্রে বর্তমান যুগের কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রয়োগ নাই বা হল !

পুরাণ-কাহিনীগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতির উল্লেখ করছিলাম। রামচন্দ্রের বনবাস আর অলকাপুরীর যক্ষের নির্বাসন এ দুয়েরই স্থান রামগিরি। প্রাচীন ভারতের রামগিরি যেন ব্রিটিশ আমলের আন্দামান।

কিন্তু রামটেকের আসল দর্শনীয় বস্তুর কথাই এতোক্ষণ বলা হয় নি। মন্দির-প্রাঙ্গণে পা দেওয়ার সাথে সাথেই চারদিক ঘিরে দাঁড়াল অভ্যর্থকেরা। দুজন দশজন হয়ে প্রায় শতাধিক—আবালবৃদ্ধবনিতা রামানুচরের দল। ভারতের বহু তীর্থেই হনুমানের প্রাদুর্ভাব। বৃন্দাবন ও কাশীর হনুমান কুখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতপরিব্রজ্যায় বহির্গত হয়ে কাশীধামে এসেছেন। এক নির্জন মধ্যাহ্নে শ্রান্ত ক্লান্ত সন্ন্যাসী পথ দিয়ে কোথাও চলেছেন। হঠাৎ একদল হনুমানের সম্মুখীন হলেন। মুখপোড়া বানরেরা সংখ্যায় ছিল বেশ ভারী আর তাদের মতিগতিও ছিল মারমুখী। তাড়া করতেই স্বামীজী বেগতিক দেখে পিছু হঠতে শুরু করলেন। বানর-

গুলিও পেয়ে বসল। স্বামীজী যতোই পিছু হটেন বানরের দল ততোই মারাত্মকভাবে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। স্বামীজী নিরুপায় হয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলেন। গঙ্গাস্নানার্থী এক সাধু দুর থেকে তাই দেখে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে স্বামীজীকে ভয়ে না পালিয়ে সাহসে ভর করে বানরের দলের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে বললেন। স্বামীজীর সুপ্ত চৈতন্যও মুহূর্তে জাগ্রত হল। তিনি সদর্পে ফিরে দাঁড়াতেই বানরের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। রামটেকের বানরযূথ বড়ই নিরীহ, বড়ই পোষমানা—মানুষের কাছে একান্ত পরিচিতের মতোই আসে, অন্তরঙ্গের মতোই গা ঘেঁষে দাঁড়ায় আর প্রসারিত করপল্লবে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করে। ভিজা ছোলা, চিনাবাদাম ও কলা যাত্রীদের অনুকম্পায় মন্দ মেলে না। নর ও বানর পরস্পরের সাহচর্য বেশ আছে রামটেকে—সহ-অবস্থান নীতির এক অতি উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামটেক পাহাড়ের নাতি-উচ্চ শিখরদেশে "মেঘদূতের" মেঘদল সত্যি পথ-শ্রান্তি অপনোদনকল্পে বিশ্রাম করেছিল কিনা, সে কথার বৈজ্ঞানিক ভাষ্যের প্রয়োজন কী? আবহমান কাল যে "মেঘদূতের" ট্রাডিশনের সঙ্গে রামগিরির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেটা মেনে নিয়ে রামটেক দর্শন করাই শ্রেয়।

কবির রামগিরি কল্পলোকের সৃষ্টি—তার হদিস স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য ভূগোল-কিতাবে মিলবে না। তাকে খুঁজতে হলে মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে আসন নিয়ে দেশদেশান্তরে উড়ে যেতে হবে। স্থূলদৃষ্টিতে যে ন্যাড়ামাথা রামটেক পাহাড়,

নর্মদার শ্বেত শৈলতট

উচ্ছলা নর্মদা
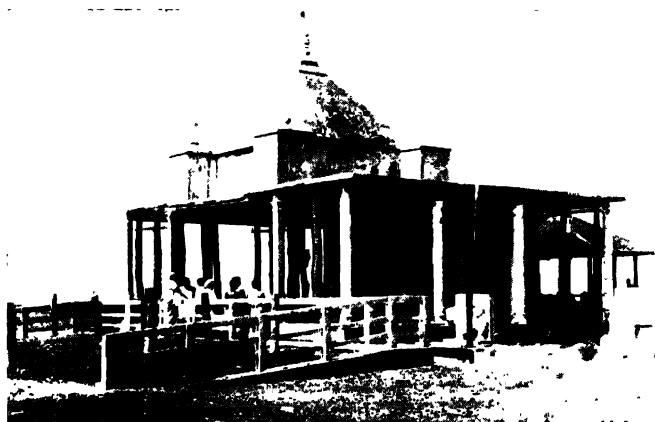
কপিলাশ্রম, গঙ্গাসাগর

সাগরজলে সিনান করি

মনশ্চক্ষে তাই স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুসমাকীর্ণ মেঘমণ্ডলমধ্যবর্তী রামগিরি! সেই আমার সান্ত্বনা।

*　　　*　　　*　　　*

নীলসলিলা নর্মদা। বিন্ধ্যশৈলসুতা নর্মদা। মর্মরতট-শালিনী নর্মদা। মধ্যভারতের এই নদীটি আর্যাবর্তের গঙ্গা-ধারার মতোই ইতিহাসের বহু পতনঅভ্যুদয়ের সাক্ষী। প্রমাণ মিলছে যে এই বহু প্রাচীন নদীর তীরে কোন বিস্মৃত অতীতে এক মহতী সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল। নর্মদার উল্লেখ রয়েছে পুরাণে। মহাবীর সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুন সুন্দরী সহচরীদের নিয়ে নর্মদার জলে জলক্রীড়ায় প্রমত্ত। সহসা এই প্রমোদ-লীলায় ব্যাঘাত ঘটল। জলস্রোতে ভেসে আসতে লাগল সমল আবর্জনা। সহস্রবাহু কুপিত হলেন নর্মদার এই অসঙ্গত আচরণে। তাঁর উচ্ছৃত হাজার বাহুর বিষম তাড়নে নর্মদার জলরাশি মথিত, উৎক্ষিপ্ত হল। কার্তবীর্যার্জুন তাঁর সহস্রবাহু দ্বারা স্রোতের গতিমুখ ফিরিয়ে দিলেন—আর সেই দিন হতে নর্মদা বিপরীত মুখে প্রবাহিতা। কিন্তু এ সব নিছক বিশ্বাস-ভিত্তিক পুরাণ কাহিনীর মূল্য আজ আর কতটুকু! সেই অতীত দিনের কাহিনী অতীতের গর্ভেই নিহিত থাক। এখন ট্যুরিস্টের দল নর্মদা বিহারে যায় প্রধানত মার্বেল রক্স (marble rocks) দেখতে। কুলকার্ণি আর কুন্তলার সঙ্গে আমিও সেই জন্যেই এসেছি। জব্বলপুর শহর থেকে মাইল পনর এসে ভেড়াঘাটে পৌঁছুলাম। তখন বিকেল হয়ে এসেছে। শীতের বিকেল, বাতাসে হিমের পরশ। গুঁড়ি

গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ভেড়াঘাটে মার্বেল রক্স দর্শনার্থীদের জন্য ডিঙ্গি নৌকা মজুত থাকে। উচিত মূল্যে একটা নৌকা ভাড়া করা গেল। নৌকায় চড়বার আগে কুন্তলা সজেস্ট করল, how's about a cup of tea। অতি উত্তম প্রস্তাব। ঘাট-মাঝিদেরই একটা টি-স্টল। কলাই-চটা এনামেলের বাটিতে খানিকটা ঘোলাটে উষ্ণ জলে চায়ের তৃষ্ণা মেটানো হল।

নর্মদা খরবাহিনী। খরস্রোতে নৌকা ভেসে চলেছে। খানিক দূরে গিয়েই সমতল তটভূমি শেষ হয়ে গেল। শুরু হল সঙ্কীর্ণ পর্বতোপত্যকাপথ। দুই পার্শ্বে খাড়া পাহাড়—জলতল হতে অন্তত একশো ফুট উচু।

সু-উচ্চ শ্বেতমর্মর প্রাচীরের মধ্যবর্তিনী নর্মদা-ধারা মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিতা। এখন শীতের নদী, তাই স্বল্পতোয়া। বর্ষায় যখন নর্মদা-দেহে পূর্ণ যৌবনের আবেগ আসে তখন তার মূর্তি হয়ে উঠে অতি ভীষণা। মর্মর তটের ঊর্ধ্বদেশ অবধি জল উঠে আসে। আর সেই স্রোতোবেগে কোন মাঝিই নৌকার হাল ধরবার সাহস রাখে না। পাহাড়ী নদী-গুলির প্রকৃতিই এইরূপ। শীতে-গ্রীষ্মে এরা ক্ষীণকায়া, অতি শান্ত, নিরীহ, কিন্তু পাহাড়ে ঢল নামলেই এরা হয়ে ওঠে দুর্বার দুকূলপ্লাবিনী। এমনিতর নদী আমাদের অতি পরিচিত দামোদর, ময়ূরাক্ষী, শিলাবতী, কাঁশাই। অবশ্য নর্মদার সঙ্গে এদের তুলনা চলে না। কুলিশকঠিন শ্বেত মর্মরে বাঁধানো নর্মদার নির্দিষ্ট গতিপথ। এ পথকে অতিক্রম করবার সাধ্য

নেই নর্মদার! জল অগভীর নয় কোন সময়েই, বারোমাসই বহতা থাকে।

* * *

তখন ধূসর সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসছে। একটা গাঢ় কুহেলিকার অবগুণ্ঠনে বিশ্ব-প্রকৃতি আত্মগোপন করল। ঊর্ধ্বে আকাশ তারাহীন মেঘাবৃত। টিপটিপ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়েই চলেছে। সঙ্গে-আনা ডাকব্যাক বর্ষাতিটি সৌজন্যের খাতিরে কুন্তলাকে দিয়ে, নিজে রুমাল বেঁধে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে মাথা বাঁচাচ্ছি। সময় আর আবহাওয়া কোনটাই নদীবিহারের পক্ষে অনুকূল নয়। ভিতরে বাইরে একটা স্যাঁত-সেতে ঠাণ্ডার ভাব। উৎসাহ প্রায় স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই নিরুত্তাপ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যেও কুলকার্ণি-কুন্তলার আনন্দ-উৎসাহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি। গল্পে-হাসিতে সারাক্ষণ মশগুল।

প্রকৃতির সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতার মধ্যে আমাদের নিঃসঙ্গ নৌকাটি নিরবচ্ছিন্ন ছপছপ শব্দে এগিয়ে চলেছে। ভেড়া-ঘাট দূরে ফেলে এসেছি। দুদিকে একই দৃশ্য—উচ্চ মর্মর তটভূমি, মাথার উপর একফালি ঘোলাটে আকাশ। এক জায়গায় তটভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে জলপ্রান্তে নেমে এসেছে। সেখানে নামা গেল। একটি ছোট্ট পর্ণকুটীর—এক সাধুর আস্তানা। আশে পাশে লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। তাই বুঝি এই নির্জনে সাধনার স্থান বেছে নিয়েছেন সাধু। আরও এগিয়ে গেলাম—কিন্তু আর কেন? কেমন যেন

একঘেয়ে লাগছে, এবার ফিরলে কেমন হয়? কুলকার্ণি বেচারার এ যাত্রাটা একেবারেই নিষ্ফলা গেল—একটা স্ন্যাপ-শটও এ অবধি নেওয়া হয় নি—আবহাওয়া প্রতিকূল। আর কিসেরই বা স্ন্যাপ-শট নেবে! খালি মার্বেল পাথর—মাইলের পর মাইল খাড়া পার যেন বেগবতী চঞ্চলা নর্মদাকে দুইদিকে দুই বাহু প্রসারিত করে বিপথগামিনী হতে দেয় নি।

কুলকার্ণি একটা শোনা-গল্প সালঙ্কারে বিবৃত করে এই নৌকাভ্রমণের একঘেয়েমি দূর করবার চেষ্টা করে। গল্পটা বলাই যাক।

এক জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রিতে এক শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক-যুগল নৌ-বিহারে বেরিয়েছে। নৌকা তরতর বেগে মর্মর প্রাচীরের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। উপরে মর্মর প্রাচীরের গাত্র-প্রলম্বিত হয়ে ছিল একটা বড় মৌচাক। প্রেমিক যুগলের মধুযামিনী যাপন হচ্ছে নীলসলিলা নর্মদার আলো-ঝলমল শান্ত বক্ষে। প্রকৃতির নিথর নীরবতা ভঙ্গ করে কানে মধুকর-গুঞ্জনধ্বনি এসে প্রবেশ করে। প্রণয়-প্রমত্ত তরুণ কৌতুক ভরে হাতের যষ্টি নিক্ষেপ করল সেই মধুচক্রের দিকে। দ্রুতগামী নৌকায় মৌমাছির নাগালের বাইরে চলে যাওয়া সহজ। কিন্তু মৌমাছি বড় আক্রোশপরায়ণ জীব! যষ্টি-নিক্ষেপে কুপিত মৌমাছির ঝাঁক প্রবলভাবে আক্রমণ করল যষ্টি-নিক্ষপকারীকে। সেই আক্রমণের হাত হতে কিছুতেই অব্যাহতি পেল না হতভাগ্যেরা। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাড়া করে এল, আচ্ছন্ন করে ফেলল নৌকারোহীদের—তাদের

সাধ্য কি নৌকা সামলায়। হুড়োহুড়িতে নৌকা হয়ে গেল বেচাল। সেই নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নর্মদার স্রোতাবর্তে সলিল-সমাধি ঘটল এক পরদেশী প্রণয়ীযুগলের। এই কাহিনীর সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, রাক্ষুসী নদী হিসাবে নর্মদার কুখ্যাতি আছে। নর্মদার সলিলগর্ভে বহু জীবনেরই অকাল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নর্মদার বহিরঙ্গ প্রকৃতি অতি শান্ত ও নিস্তরঙ্গ, কিন্তু এর অন্তরাবর্ত অতি সাংঘাতিক। উপলাস্তীর্ণ অববাহিকার নানা জায়গায় আছে গভীর খাদ—সেই সব জায়গাতেই গুপ্ত আবর্ত সৃষ্টি হয়, আর স্রোতের আকর্ষণে একবার সেই আবর্তে পড়লে আর রক্ষা নাই।

*　　*　　*　　*

গল্পে গল্পে একঘেয়েমি অনেকটা হ্রাস পায়। কুলকার্ণিকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কুন্‌তলাকে—এঁদের উৎসাহ-আগ্রহই আমাকে টেনে এনেছে এখানে। ভালোমন্দ যেমনই লাগুক, জব্বলপুরের মার্বেল রক্স দেখবার মতো আর গল্প করবার মতো জিনিস বটে।

সমুদ্র-সঙ্গম

সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যেখানেই যুগ যুগ ধরে মানুষ মনের ব্যাকুলতা নিয়ে জড়ো হয় পুণ্যসঞ্চয়ে ও পরমার্থের সন্ধানে সেখানেই তীর্থ, আর সেখানেই শ্রীভগবানের মহিমময় প্রকাশ। ভারতের তীর্থগুলি প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা-নিকেতন! উত্তুঙ্গ হিমাচল-শীর্ষের গঙ্গোত্রী, জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিধারা-সঙ্গমে প্রয়াগ আর সমুদ্রাভিসারিণী গঙ্গা-মোহানা, গঙ্গা-মাহাত্ম্য এই তিন স্থানেই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে।

মহারাজ ভগীরথের কঠোর তপস্যায়, তুষারশৃঙ্খলিতা গঙ্গাধারা যেন করুণায় দ্রবীভূতা হয়ে প্রবাহিতা হলেন ভারতভূমির উপর দিয়ে। ভারতভূমির কণ্ঠহার-স্বরূপিণী গঙ্গা। এর তীরেই প্রকটিত হয়েছিল আর্য-সভ্যতা। গঙ্গাকে অবলম্বন করেই ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে যুগে যুগে। গঙ্গাধারার কলধ্বনিতে মিশে আছে ভারতের শাশ্বত বাণী। নদীবাহিত পলিমৃত্তিকায় গড়ে উঠেছে উর্বর গাঙ্গেয় দেশ। গঙ্গাধারার উজান-ভাঁটির টানে যুগে যুগে

সওদাগর-শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহের বাণিজ্য-তরণী ভেসে চলেছে ধন-লক্ষ্মীর সন্ধানে। এই উপমহাদেশের ভাগ্য-বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই পুণ্যতোয়া নদী।

গঙ্গাসাগরের মহিমা কীর্তন করেছেন বাঙালীর প্রিয় কবি কৃত্তিবাস :

সাগরের সঙ্গে গঙ্গার হইল মিলন
মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাঁহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥
যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥

ভক্ত ভগীরথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। পতিতোদ্ধারিণীর পুণ্য পরশে ঋষিশাপগ্রস্ত সগরাত্মজগণের মোক্ষ লাভ হল। এ হল পুরাণ কাহিনী। এ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই আবার রচিত হয়েছে অভিনব অর্থনীতিক তত্ত্ব। বিখ্যাত পূর্তবিশারদ স্যর উইলিয়ম উইলকক্স বলেন ভগীরথ ছিলেন একজন বড়ো পূর্ত-ইঞ্জিনীয়ার। ভাগীরথী নদী আসলে কোন হাজা-মজা নদীর পুনঃসংস্করণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা মরুভূমিতে খাল কেটে মানুষের বাসোপযোগী অঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস করছেন। গঙ্গা-জলপ্রবাহে তেমনি কোন অনুর্বরা, অহল্যা ভূমির পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল বোধ হয়। ভস্মীভূত সগরসন্তানগণের মুক্তির কথা বোধ হয় কোন পৌরাণিক ভূমি-উন্নয়ন প্রচেষ্টার রূপক-কাহিনী মাত্র।

স্মরণাতীত কাল হতেই গঙ্গাসাগর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

তীর্থ। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে এখানে হয় এক বিরাট ও বিচিত্র সাধুসমাগম। এতো নাগা সাধুর একত্র সমাবেশ ভারতের আর কুত্রাপিও দেখা যায় না। গঙ্গা এখানে শত-সহস্রমুখী না হলেও অসংখ্যমুখী হয়ে সমুদ্রদয়িতের সুনীল আলিঙ্গনে আত্মনিবেদন করেছে। দূরবিস্তৃত রূপালি সৈকত, তার পরে নিস্তরঙ্গ অগভীর জল; বহুদূর অবধি হেঁটে যাওয়া চলে। বিস্তীর্ণ সৈকতভূমি অসংখ্য খাল ও নালায় বিকর্তিত। সমুদ্রের জোয়ারে নালাগুলি জলে ভরে যায়, আবার ভাঁটার টান শেষ হলেই অগভীর পাঁকপূর্ণ খাদে পরিণত হয়। ভাঁটার সময় অবলীলাক্রমে পেরিয়ে গেলাম অনেকগুলি খাল—কিন্তু জোয়ারে ফেরবার সময় চারদিকে অথৈ জলের খরস্রোত।

* * *

কলকাতা থেকে সোজা পিচ-ঢালা সড়কে মোটর হাঁকিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূর কাকদ্বীপ অবধি অবলীলাক্রমে যাওয়া চলে আজকাল। দেশ পুনর্গঠনের কাজ চলেছে পুরাদমে। এই পশ্চিমবঙ্গেই গত ৭।৮ বৎসরে কী অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে! পূর্বেকার দিনে কাকদ্বীপ যেতে হলে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে ভাঁটা ধরে এক রাত্রি ঠায় নৌকায় কাটাতে হত। সেখানে আজকাল সরাসরি কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কাকদ্বীপের এই পথটা আরও এগিয়ে যাচ্ছে—একেবারে সমুদ্রের কিনারায় ফ্রেজারগঞ্জ অবধি।

হায় সেকাল! গঙ্গা-সাগরের তীর্থ-মাহাত্ম্য পুরাণপ্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর দল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল

নদীপথে নৌকাযোগে সাগরসঙ্গমের অভিমুখে অগ্রসর হত। পথে প্রতি পদেই বিপদ—জলদস্যু, হার্মাদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পানীয় জলের অভাব, মড়ক আরও কতো কি! বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" আর রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" বঙ্গসাহিত্যে সাগরতীর্থকে অমরত্ব দান করেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের লেখার ব্যঞ্জনায় সাগর-যাত্রার যে করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে, মানুষের দুর্ভোগ কাহিনীর তাও আংশিক আলেখ্য মাত্র। সে সময়ে রেল-স্টীমার-পাকা সড়কের বালাই ছিল না। নদীপথে দাঁড়টানা নৌকায়, আর স্থলে পায়ে-হাঁটা পথে সাধারণ মানুষ চলাচল করত দলবেঁধে দস্যুতস্করের ভয়ে। যাঁরা সঙ্গতিশালী তাঁরা অবশ্যি লোক-লস্কর পাইক-প্রহরী সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণ করতেন হয় পালকিতে নয় অশ্ব-গজারোহণে; কিন্তু সে আর কয় জন! এই গঙ্গাসাগরের পথে কতোই না সকরুণ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে! কতো দল-ছাড়া অসতর্ক তীর্থকামী হয় দস্যু-তস্করের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, নয় ব্যাঘ্র-কুম্ভীর-কবলিত হয়েছে। সাগরসঙ্গমে পানীয় জলাভাব। মানুষের পানযোগ্য মিষ্টি জল সেখানে নেই। অনন্ত-বিস্তার সুনীল জলরাশি—কিন্তু লবণাক্ত, মানুষের পানের অযোগ্য।

পূর্বে তীর্থযাত্রীরা বড়ো বড়ো মাটির বা পেতলের জালায় মিষ্টি জল নৌকায় বয়ে নিয়ে যেত। যদি কোন কারণে সে সংরক্ষিত জলের ঘাটতি পড়ত তবেই ঘটত বিষম বিপদ। সংক্রামক মহামারী রোগেই বা কতো লোকের প্রাণহানি ঘটত! নৌকার মাঝিরা বহর বেধে নদীপথে চলাফেরা করত।

গঙ্গাসাগরগামী নৌকার মাঝিকে সঠিক হিসেব রাখতে হত নদীর জোয়ার ও ভাঁটার! অনেক বেহিসেবী মাঝি বহর থেকে ছিটকে পড়ে বিপন্ন হত। অকূল দরিয়ায় বহু নৌকার সলিল সমাধি ঘটত। সেই সব বিগত দিনে গঙ্গাসাগর যাত্রা ছিল এক অনির্দেশ্য ভয়াবহ অভিযান। কিন্তু পথের দুর্গমতাই যেন সাগরসঙ্গমকে দিয়েছিল পুণ্যক্ষেত্রের অপরিমেয় মর্যাদা। 'দুর্গম পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি।'

যাক সে সব পুরানো কথা। সেকাল হতে একালে আসা যাক। কলকাতা হতে কাকদ্বীপ যাবার কথা বলছিলাম। পঞ্চাশ মাইল পথ, কিন্তু ক্ষিপ্রগতি মোটরে মনে হয় যেন এপাড়া-ওপাড়া। কাকদ্বীপ দক্ষিণাঞ্চলের একটা বড় বন্দর—ধান চাল, কাঠ ইত্যাদির ব্যবসা-কেন্দ্র। আবার সমুদ্রপথে বিদেশী জাহাজের মারফত নানা নিষিদ্ধ বে-আইনী কারবারের ঘাঁটিও হচ্ছে কাকদ্বীপ।

এখানকার বাজারটা খুবই বড়। হাটের দিন কাকদ্বীপের ঘাটে হাজার দেশীয় নৌকার সমাগম হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি হাই স্কুল আর গৌড়ীয় সেবাশ্রম। এখানে গঙ্গা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণকায়া—কারণ নদীবক্ষ এখানে এক বিরাট চরে দ্বিধা বিভক্ত। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।' নদীর মূল ধারাটি চরের অপর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত। কাকদ্বীপের গাঙ অপ্রশস্ত কিন্তু খরস্রোতা। এসব গাঙে নৌকা চলাচল নির্ভর করে জোয়ার-ভাঁটার উপর অথবা বাতাসের মর্জির উপর। তীব্র স্রোতের

প্রতিকূলে শুধু দাঁড় বেয়ে নৌকা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাঝিরা জোয়ার-ভাঁটার সঠিক হিসাব রাখে, এবং সেই হিসাব মতো নৌকা ছাড়ে। কথায় বলে এক জোয়ার বা এক ভাঁটার পথ।

অনুকূল স্রোত, তার উপর পালে লেগেছে বাতাসের বেগ। চরটাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের নৌকা বড় নোনা গাঙে এসে পড়ল। এখানে নদীর রূপ ভিন্ন প্রকারের। নদীবক্ষ বাত্যাবিক্ষুব্ধ, সতত আন্দোলিত। নদীর বিস্তার এখানে ৮।১০ মাইল, অতিদূর তটপ্রান্তে দেখা যায় ক্ষীণ শ্যাম রেখা—মহাসমুদ্রের আভাস। দূরে দূরে পালতোলা বহু নৌকা চলেছে দূরাভিসারে। ক্বচিৎ দু-চারটা বিপুলকায় সমুদ্রচারী জাহাজের দর্শনও মেলে। নৌকার গতি অতি ক্ষিপ্র দুর্নিবার। ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানা চঞ্চল, আন্দোলিত। কিন্তু নৌকার হাল মাঝির শক্ত মুঠায় স্থির অবিচল। জলতরঙ্গ ভেদ করে অনুচ্চ কলোচ্ছ্বাসে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। ভাঁটার টানে ও বাতাসের গুণে আমাদের স্ফীতোদর মন্থরগতি নৌকাখানা মাত্র ঘণ্টা-চারেকেই চল্লিশ মাইল দূরবর্তী মনসাদ্বীপের ঘাটে এসে ভিড়ল।

নদীর মোহানায় বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ধানক্ষেত, ও তারই মাঝে মাঝে গ্রাম—তাই নিয়ে মনসাদ্বীপ। জনবসতি নেহাত কম নয়, তবে ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। গ্রামগুলি দূরে দূরে বিস্তীর্ণ ধান-ক্ষেতের ব্যবধানে অবস্থিত। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রকূলোপবর্তী জনপদবাসিগণের প্রধান উপজীবিকাই হচ্ছে ধানচাষ, কাঠ আর

মাছের ব্যবসা। উঁচু মাটির জাঙ্গাল বেঁধে সমুদ্রের লোনা জল প্রতিহত করা হয়, আর সেই বাঁধের আশ্রয়ে হয় চাষবাস। কিন্তু যদি কোন দুর্বিপাকে বাঁধ ভেঙে যায়, তবে আর রক্ষা থাকে না। সমুদ্রজলের লবণাক্ত স্পর্শে ক্ষেত ক্ষেত-খামার সবই নাশ হয়ে যায়। মানুষের হয় অশেষ বিপদ। দুর্ভিক্ষের হাহাকার পড়ে যায়। এমন ঘটনা কখনো কখনো ঘটে। সমুদ্র রুষ্ট হয়ে ওঠেন, সমুদ্রজল অস্বাভাবিক ফুলে ওঠে। সে জলপ্লাবনের আবেগকে মানুষের হাতে গড়া মাটির জাঙ্গাল রুখতে পারে না। এমনিধারা একটা বিপর্যয় ঘটেছিল প্রায় বছর বিশেক আগে। সমগ্র অঞ্চলটাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জলে জলময় হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি ঘরদোর প্রভূত সংখ্যায় বিধ্বস্ত হয়েছিল ; মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানিও হয়েছিল বিস্তর। এমনধারা বিপর্যয় অবশ্যি কালে ভদ্রেই হয়। তবু ভবিষ্যৎ সতর্কতা অবলম্বনস্বরূপ জায়গায় জায়গায় খুব উঁচু পাকা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। বিপদের সময় মানুষ এসে এখানে আশ্রয় নিতে পারে।

মনসাদ্বীপ নামটি সার্থক। ধানক্ষেতের আল দিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে যেতে হয়, পা পিছলে পড়ে যাবার আশঙ্কা। আশে পাশে, সামনে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—প্রতি পদেই সর্পভীতি। অনধ্যুষিত জলা মাঠ, আর সুন্দরবনের সান্নিধ্যেও বটে—মা মনসার বাহনেরা এখানে সংখ্যায় অগণ্য। সুন্দর-বনের বাঘ, কুমির আর সাপ।

“বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি॥”

মাইল দুই পথ ভেঙে মনসাদ্বীপের রামকৃষ্ণ মিশন' আশ্রমে গিয়ে উঠলাম। মঠের মহারাজ নদীর ঘাটেই এসেছিলেন আগ বাড়িয়ে নিতে। মহারাজের সন্ন্যাসী-নাম স্বামী নিরাময়ানন্দ—সদা সহাস্য আনন্দময় পুরুষ। স্কুলজীবনে আমার এক ক্লাশ নিচুতে পড়তেন। এক মাঠেই খেলাধূলা হৈ চৈ করতাম। তারপর দীর্ঘদীন ছাড়াছাড়ি; জীবনের গতিপথও ভিন্ন হয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে আবার দেখা। আমি তাঁকে আদৌ চিনতে পারি নি, কারণ চেহারা, বেশভূষা ও পরিবেশ সবই অপ্রত্যাশিত,—এমন কি নামটিও পরিবর্তিত। তিনি কিন্তু আমাকে সহজেই চিনে ফেললেন বয়স এবং তজ্জনিত নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও।

দক্ষিণবঙ্গের এই শেষ প্রান্তে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসী-গণের সেবাই এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ও নির্ধারিত কার্যক্রমের একটি প্রধান পর্যায় হচ্ছে দেশে সংশিক্ষার বিস্তার। আজ রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় রামকৃষ্ণ মিশন দেশে শিক্ষাবিস্তারকল্পে নানা উদ্যোগ করছেন। মনসাদ্বীপ আশ্রমটিও এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর। পূর্বে এখানে ছিল একটি মাত্র টিম-টিমে প্রাইমারি স্কুল। সেই প্রাইমারি স্কুলটিই এখন হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজচেতনা জাগ্রত করবার জন্য একটি সমাজমিলন কেন্দ্রও

স্থাপিত হয়েছে। আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে আশ্রম-কর্মিগণের চেষ্টায় কয়েকটি সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারের কাজও বেশ চলেছে। এই গ্রন্থাগারের বইগুলি স্থানীয় পল্লীবাসিগণের মধ্যে সু-সাহিত্য পাঠে অনুরাগ সৃষ্টি করার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেছে। আশ্রমের পরিবেশটি শান্ত ও মনোরম। স্কুলবাড়ি ও সমাজ-মিলন কেন্দ্র গৃহটি ছাড়া আরও কয়েকটি ঘর আছে, সেগুলিতে আশ্রমকর্মী ও কয়েকজন শিক্ষক থাকেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণের প্রবেশপথেই আছে কয়েকটি যোজনগন্ধা ফুলের গাছ। আশ্রম প্রবেশের পথেই একটা স্নিগ্ধ গন্ধ আগন্তুককে স্বাগত জানায়। আর আশ্রম-প্রাঙ্গণের মধ্যেই আছে একটি কাকচক্ষু স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকা।

উষাগমের পূর্বেই মহারাজের সঙ্গে রওনা হলাম সাগর-তীর্থের উদ্দেশ্যে। আশ্রম থেকে প্রায় ৩।৪ মাইল পথ ধান-ক্ষেতের আল ধরে ধরে হাঁটতে হবে। প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর একটা ঝোপের আড়াল ঘুরতেই সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত নীলাম্বুরাশি দৃষ্টি-গোচর হল। সূর্য তখনও পূর্ণ মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নি। দূর পূর্ব দিগ্বলয় সবেমাত্র রক্তাভ হয়ে উঠেছে। সমুদ্রচারী বিহঙ্গদলের কলকণ্ঠে উষাকাল সঙ্গীতময়। সমুদ্র প্রায় স্থির, অচঞ্চল—যেন অনন্তের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। অদূরে কপিলাশ্রম। ইষ্টক-নির্মিত শুভ্রবর্ণ একটি ছোট্ট মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ তিনটি—গঙ্গামাঈ, মহারাজ ভগীরথ ও মহর্ষি কপিল। প্রতি বৎসর

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। সেই সময় গঙ্গাসাগরে একটা বিরাট অস্থায়ী তাঁবু আর ডেরার শহর বসে যায়। দোকান, বাজার, হোটেল, হাসপাতাল, সেবা-কেন্দ্র, রংতামাশা কোন কিছুরই অভাব থাকে না। এক কুম্ভমেলা ছাড়া এতো সাধু-সমাগমও কোন তীর্থে হয় না। আর সাধুই বা কত বিচিত্র জাতের। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দু মিশন প্রভৃতি আধুনিক প্রতিষ্ঠানের পরিচিত সাধু-মহারাজারা ছাড়াও আ-সমুদ্র-হিমাচল বিস্তীর্ণ এই উপমহাদেশের নানা প্রান্ত হতে সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসীর আগমন হয় অগণিত সংখ্যায়। উলঙ্গ-প্রায় নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যাধিক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদল আংটি-সাধুর দেখা মিলল। এঁরা আংটি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যৌন-সংযম রক্ষা করছেন। কেউ ধুনি জ্বালিয়ে অষ্টপ্রহর আগুনের প্রখর তাপে দেহকে ঝলসাচ্ছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই। তীক্ষ্ণ লৌহ-কণ্টক শয্যায় অবলীলাক্রমে শায়িত রয়েছেন কেউ।

কপিল মন্দির পরিদর্শন করে সমুদ্রজলের দিকে এগিয়ে গেলাম অবগাহন মানসে। মন্দিরের নিকটবর্তী উপকূলভাগ নরম বালুকাময়। রজতশুভ্র দীর্ঘ বিস্তীর্ণ সৈকতভূমি অতিক্রম করে সমুদ্র-জলের শীতল স্পর্শ লাভ করতে হয়। উপকূলের এ অংশটা অগভীর, হাঁটুজল ভেঙে আধ মাইল অবধি অনায়াসে যাওয়া যায়—তারপর জলের গভীরতা কিছুটা বাড়ে —সাঁতার জল আরও দূরে। স্নানের পক্ষে এ জায়গাটা যেমন নিরাপদ তেমনি সুবিধাজনক। সে সময়টা শীতকাল—

সমুদ্র নিস্তরঙ্গ শান্ত। মনের খুশিতে অনেকক্ষণ জলে গা ডুবিয়ে সমুদ্রের লবণ-স্পর্শ টুকু নিলাম। সম্মুখে অন্তহীন নীলাম্বু-বিস্তার—উপকূল-রেখা অর্ধচন্দ্রাকারে শ্যামাঙ্গিনী বসুন্ধরাকে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধেছে। ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলাম্বর সূর্যালোকে ময়ূখময়। দূর গগনে বলাকাবদ্ধ সাগর-বিহঙ্গ দল। তটভূমি মৃদু জল-তরঙ্গের আঘাতে ঈষৎ শব্দমুখর। প্রকৃতির স্থির শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি কি সুন্দর!

স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান—আদিঅন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে॥

* * *

সমুদ্রস্নান শেষ করে যখন ডাঙায় উঠে এলাম তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। বেরিয়েছি কোন্ সকালে! পায়ে হেঁটে এতটা পথ এসেছি তার উপর এতক্ষণ ধরে স্নান—ক্ষুধাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। কপিল-আশ্রম ও মেলাক্ষেত্রের অনতিদূরে এক নিঃসঙ্গ সাধুর আস্তানা। রামকৃষ্ণ-ভক্ত, তবে এখনও ভেকধারণ করেন নি। নির্জনে একক সাধনায় নিযুক্ত, নাম ব্রহ্মচারী পদ্মনাথ। সাধনার যোগ্য স্থানই বেছে

নিয়েছেন। কপিল-মন্দিরের পূজারী ঠাকুর ভিন্ন পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে আর তৃতীয় মানুষ কেউ নেই। কপিল-মন্দিরের পূজারী ঠাকুর প্রতিদিন পূজা-কৃত্যাদি সমাপনান্তে দূর গাঁয়ে চলে যান। তিনি গাঁয়েই থাকেন। তিনি নিজেকে অযোধ্যাবাসী এবং শ্রীরামচন্দ্রের কুল-পুরোহিতের বংশধর বলে দাবি করেন। সাগরতীরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন এই যুবক ব্রহ্মচারী। জীবনের কোন পরম রহস্যের সন্ধানে নিযুক্ত রয়েছেন ইনি! সরল সদাহাস্যময় যুবক প্রথম দর্শনেই প্রীতি আকর্ষণ করেন। একটা বাঁশের বেড়া-দেওয়া খড়ের ঘরে বাস করেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তির বদান্যতার দান একটি ভাত রাঁধবার হাঁড়ি, একটি ঘটি, কৌপীন ও বহির্বাস, বাঁশের মাচায় গোটা দুই কম্বল আর একটি একতারা—এই সামান্য উপকরণ সম্বল করেই সাধক পদ্মনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী। পূর্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল। দূর গাঁয়ের সম্পন্ন গৃহস্থের আনুকূল্যে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। জাল ফেলে পুকুর হতে মাছ ধরা হয়েছে। ভাজা, তরকারির ব্যঞ্জন, মাছের ঝোল ও দই—কিছুরই ত্রুটি নেই—স্নান সেরে পৌঁছুবা-মাত্রই আহার প্রস্তুত পাওয়া গেল। অতীব তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করলাম।

পদ্মনাথজী তাঁর মাচানে চাটাই পেতে আহ্বান জানালেন একটু বিশ্রাম করে নিতে। ইতস্ততঃ না করেই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। স্বামীজী ও পদ্মনাথজী ভূমিতে দুখান আসন পেতে বসলেন। সন্ন্যাসীদের নাকি দিবানিদ্রা দিতে নাই।

পদ্মনাথ সত্যিই-গুণী ব্যক্তি। লাউখোলের একতারায় মৃদু ঝঙ্কার তুলে ভজন শুরু করলেন। বহুদিন পূর্বে শোনা কান্ত কবির মধুর কোমল পদ—

সে যে পরম প্রেমসুন্দর
জ্ঞান-নয়ন-নন্দন।
পুণ্যমধুর নিরমল,
জ্যোতিজগত-বন্দন॥

বহিঃপ্রকৃতির নিথর নীরবতায় কোমল ছেদ টেনে নভোচারী গাংচিলের ডাক শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কুটির-প্রাঙ্গণে একতারা সহযোগে পদ্মনাথের মধুক্ষর কণ্ঠসঙ্গীত।

Music that gentlier on spirits lies
Than tired eye-lids on tired eyes.

ঘুমাবেশে চোখের পাতা মুদিত হয়ে গেল। তাকে জোর করে খুলে রেখে লাভ কী!

সমুদ্র-মোহানায়

ফ্রেজারগঞ্জ থেকে দ্বারিকনগর অভিমুখে চলেছি। ভাঁটা ধরে ফ্রেজারগঞ্জের খাল দিয়ে মাইল পাঁচেক গিয়ে তবে বড় নোনা গাঙ। সরাসিরি মাইল পনর-কুড়ি পাড়ি দিয়ে দ্বারিকনগর-খালের মুখ পাওয়া যাবে। কথায় বলে গৌরবে বহুবচন—এখানে 'নোনা গাঙ' কথাটা কিন্তু গৌরবের নয় বরঞ্চ অগৌরবের। এ যে সাক্ষাৎ সমুদ্র—ধূ ধূ জলরাশি! এদিককার স্নিগ্ধশ্যাম দীর্ঘায়িত তটরেখা ধীরে ধীরে ধূসর দিগন্তে অবলুপ্ত হয়ে গেল—মাটির পৃথিবীর সুদূর আশ্বাসটুকু যেন হঠাৎ বিলীন হয়ে গেল। অপর দিগন্ত তখনও অস্পষ্ট ও দুর্নিরীক্ষ্য। সাগর-মোহানার এই কূলহীন অনন্তবিস্তার জলরাশি অতিক্রম করছি একটি হালকা ক্ষীণকায় দোমাল্লা নৌকা অবলম্বন করে। সমুদ্র আজ শান্ত নিস্তরঙ্গ। তাই ভরসা। পালে অনুকূল পবনের আবেগ লেগেছে। তীব্র তরতর বেগে আমাদের ছোট্ট নৌকাটি এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি আজ বড়ই সুপ্রসন্না। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি হবে। আকাশ-ভুবন আলোকময়। চাঁদের কী ভুবন-ভোলানো হাসি!

আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রাহারা শশী

ওই স্বপন-পারাবারের খেয়া
আপনি চালায় বসি।

কবি-কল্পনার কি অপরূপ প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি! অকৃপণা প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য-সম্ভার এই জ্যোৎস্না-পুলকিত আকাশের কোলে ঢেলে দিয়েছে। এমন স্নিগ্ধ চাঁদ যেন হাজার বছরেও একটিবার পৃথিবীর দিকে চেয়ে এমন মধুর হাসি হাসে নি! আজ গঙ্গা-মোহানায় চাঁদের হাসির বান ডেকেছে! সহযাত্রী বন্ধু দার্শনিক বিজ্ঞতার সঙ্গে মন্তব্য করলেন এই মধুময়-মুহূর্তটিতে গঙ্গাগর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করাও কাম্য। আমি আপত্তি জানালাম। 'আমি'ই যদি না রইলাম তবে এই সুন্দর শুভ মুহূর্তটির কী মূল্য রইল! মানুষ দু চোখ মেলে দেখে বলেই, দু কান দিনে শোনে বলেই, তার ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করে বলেই তো এই রূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দময় প্রকৃতির সার্থকতা! উপকূলের কাছাকাছি আরও বহু নৌকার দেখা মেলে, কিন্তু মাঝ দরিয়ায় আমরা হলাম নিঃসঙ্গ। সহগামী কোন নৌকারই দর্শন মিলল না। এমন নিঃসঙ্গ যাত্রা একেবারেই বিপদভয়হীন একথা বলা চলে না। দীর্ঘ কুড়ি মাইল মোহানা-পথ অতিক্রম করতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগল। সময়টা কাটল আনন্দ-আতঙ্ক-মিশ্রিত একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থায়! এতোবড় দরিয়া একটা ছোট্ট ডিঙিতে পার হওয়া দুঃসাহসিকতা বই কি! আমাদের ভাগ্য-গুণে নদীর অবস্থা শান্ত, পোষমানা—তাই সম্ভব হল এই দীর্ঘ দুঃসাহসিক জলপথ-পরিক্রমণ। সাধারণতঃ বড় বড়

ভারী মহাজনী নৌকাই ব্যবহৃত হয় এই সব পথে। এক একখানা নৌকা যেন এক-একটি ছোটখাট জাহাজ—বিরাট বিরাট পাল তুলে বায়ুভরে উপকূলপথে এদের নিত্য আনা-গোনা। এরাই উপকূল-বাণিজ্যের প্রধান বাহন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ খালপথে এই সব ভারী নৌকা প্রায় অচল। তাই বড় নৌকার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে হালকা দ্রুতগতি ডিঙ্গির সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর মনে হয়েছিল।

*　　　*　　　*

এ সব অঞ্চলে খালগুলিই হচ্ছে চলাচলের প্রধান পথ। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে দিনে দুইবার এই খাল-গুলির কলেবর বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। জোয়ারে খালগুলি কানায় কানায় জলে ভরে যায়—তীব্র খরস্রোতা জল খালের ভিতর অনুপ্রবেশ করে। আবার ভাঁটার সময় খালগুলি হয় ক্ষীণতোয়া। জোয়ারে জল যে পর্যন্ত ওঠে আর ভাঁটায় যে পর্যন্ত নামে সেই অংশটুকুকে বলা যেতে পারে "নো-ম্যান্স ল্যাণ্ড"। দিন রাতে দুবার জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে। ফলে এই "নো-ম্যান্স ল্যাণ্ড" সব সময়েই হয়ে থাকে সিক্ত ও পঙ্কিল।

এ কাদা এঁটেল ও গভীর—জানুদেশ অবধি কাদায় প্রোথিত হয়ে যাবার আশঙ্কা। ভাঁটার সময় নৌকায় চড়া বা নৌকা থেকে ডাঙায় নামা ভারি মুশকিল। ও সব অঞ্চলের লোকেরা এই অবস্থায় অভ্যস্ত। আমরা বহিরাগত। কাদায় পড়ে নাকানি-চুবানি খাওয়ার সম্ভাবনা। তীর থেকে বেশ

খানিকটা দূরে নৌকা রাখা হয়েছে—আর একখানা সরু পাতলা তক্তা পেতে নৌকার সঙ্গে তীরের সংযোগ সাধন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই তক্তাখানাকে অবলম্বন করেই ওঠা-নামা করতে হবে। হাতে আঁকড়ে ধরবার কোন অবলম্বন নেই। সার্কাসে যারা রোপ-ওয়াকিং বা টানা দড়ির উপর অবলীলা-ক্রমে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে নানা কৌশল দেখায় তাদের কাছে বিদ্যাটা সময়মতো শিখে নিলে এখন কাজে লাগত। আমরা জন দু-তিন পড়ি-পড়ি করতে করতে কোনও রকমে সেই তক্তা বেয়ে তীরে নামলাম। কিন্তু বিপদ ঘটল শান্তি-বাবুকে নিয়ে—তিনি তাঁর বিপুল বপুখানা নিয়ে ওই ক্ষীণ তক্তাখানা অবলম্বন করে এই কর্দম-সংকট উত্তীর্ণ হবার ভরসা পেলেন না। আমরাও ভরসা দিতে পারলাম না। দৈবাৎ পা ফসকে পড়ে গেলে কী হবে সে কথা ভাবাও কষ্টদায়ক। ওই গভীর পঙ্ককুণ্ড থেকে শান্তিবাবুকে পুনরুদ্ধার করা যে রীতিমতো স্যালভ্যাজ অপারেশন (Salvage operation)। সহযাত্রী অনন্তবাবু রহস্য করে কপিকল বিকল্পে নৌকার মাস্তুলের পাল টাঙাবার বাঁশের দড়িতে ঝুলিয়ে শান্তিবাবুকে চ্যাংদোলা করে নৌকা থেকে নামিয়ে আনবার প্রস্তাব করলেন। এ প্রস্তাব আদৌ কার্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা—এবং সম্ভব হলে যে অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হত তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। যাহোক নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে এমন সময় একটা সুন্দর সুযোগ পাওয়া গেল। ঘাটের অদূরে একখানা তালগাছ-খোদাই ডোঙা পড়ে ছিল। সেটাতে কোন প্রকারে

চাপিয়ে দড়ির সাহায্যে জন ছয় সাতে টেনে হিঁচড়ে কাদার উপর দিয়ে শাস্তিবাবুকে শক্ত মাটির উপর তোলা হল। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। জোয়ারের আশায় বসে থাকলে ৬।৭ ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে হত।

*　　　*　　　*

ক্রমে ধূসর দিগন্তে একটা ক্ষীণ কালো রেখা দৃষ্টি-গোচর হল। তীরের আভাস দেখা যাচ্ছে। এখনও ৫।৬ মাইল পথ বাকি। জ্যোৎস্না-ঝলমল জলস্থল-অন্তরীক্ষ আরও মোহময় অপরূপ হয়ে উঠেছে। আমরা মোহাবিষ্টের মতো এই দীর্ঘ পারাবার পরিক্রমণ প্রায় শেষ করে এনেছি—সময় যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল তা প্রায় টেরই পেলাম না। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত ৯টা।

আরও ঘণ্টাঘানেক চলার পর দ্বারিকনগরের খালে ঢুকলাম। রাত তখন দশটা। এতোক্ষণে খালে জোয়ার এসে গেছে। আমাদের মাঝিদের টাইম-সেন্স একেবারে নির্ভুল। ভাঁটা ধরে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ছিলাম, আর ঠিক জোয়ারে এসে দ্বারিকনগরের খালে ঢুকলাম। একটুকু এদিক-ওদিক হয় নি। জোয়ারভাঁটার তালে সঙ্গতি রেখে না চললে বহু সময়ের অপচয় ঘটে।

দ্বারিকনগরের বাজারে পৌঁছুলাম রাত এগারটায়। বাজারের একটা দিক অপেক্ষাকৃত ফাঁকা—সেখানেই একটা স্কুলঘরে আমাদের রাত্রিবাসের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আহারের পর একটু বিশ্রাম করছি। স্কুল-ঘরের বারান্দায়

চেয়ার পেতে বসে আমরা ৩।৪ জন আর স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, মেম্বর আরও জনা পাঁচ-ছয়।

আগামী দিনের কার্য-সূচী নিয়েই মূল আলোচনা। এ অঞ্চলে স্কুল, পাঠশালা, লাইব্রেরি কি এবং কোথায় কোথায় আছে তারই একটা মোটামুটি হিসাব নিচ্ছিলাম। কথার ফাঁকে ফাঁকে দেশের ফসলের অবস্থা, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, সাপ ও কুমিরের উৎপাত ইত্যাদি বিষয়েও কথাবার্তা হচ্ছিল। চারদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। স্কুলঘরের সামনে একটু এগিয়ে গেলেই খাল—মাঝে মাঝে দু-একখানা নৌকা খাল দিয়ে যাতায়াত করছে। আগামী কাল হাট—কারবারী মানুষের আনাগোনা রাত্রি হতেই শুরু হয়েছে। খালের দু-পাশ দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট কড়ি গাছের সারি। গাছগুলি মাঝারি রকমের—পত্রপল্লবে সমাকীর্ণ। তলদেশ ছায়াচ্ছন্ন ও সতত কর্দমাক্ত।

এই স্থান বড়ো বিপজ্জনক। ছায়ার অন্ধকারে সাক্ষাৎ শমন আত্মগোপন করে থাকে। নোনাগাঙে নক্র-হাঙ্গর-কুম্ভীরের বিষম প্রাদুর্ভাব। আহারের সন্ধানে বড় নোনাগাঙ থেকে বড় বড় কুমির, ঘরেল আর কখনো কখনো হাঙ্গর খালে ঢোকে। খালের দু ধারে মাটির বাঁধ বা ভেড়ি দিয়ে নোনা জল যাতে ক্ষেতে-খামারে ঢুকে ফসল নষ্ট না করে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই বাঁধ অতিক্রম করে জলের দিকে যাওয়া এই সব অঞ্চলে আদৌ নিরাপদ নয়। স্থানীয় অধিবাসীরা খুব হুঁশিয়ার—চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করে।

আমরা যে রাত্রি দ্বারিকনগরে পৌঁছুলাম তার দিন দুই পূর্বেই একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই দ্বারিকনগরের ঘাটেই। সে রাত্রিটাও ছিল এমনিতর জ্যোৎস্নাময়ী। এ গাঁয়েরই প্রৌঢ় গৃহস্থ জলধর সাঁই ঝাঁকি জাল দিয়ে বাজারের ঘাটের অনতিদূরে মাছ ধরছিল। ক্ষেপ দুই দেওয়া হয়েছে—মাছও কিছু জুটেছে। আরও ক্ষেপ দুই দিয়ে আরও কিছু মাছ সংগ্রহ করবার ইচ্ছা—বাড়িতে কুটুম্ব এসেছে কিনা। বাজারের লোকজন তখনও সবাই জেগে। হঠাৎ জলধরের চীৎকারে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। 'ওরে বাবারে কুমিরে ধরেছে, আমাকে বাঁচাও।' লোকজন যে যেখানে ছিল ছুটে গেল ঘাটের দিকে। কড়িগাছের ঘন ঝোপের ছায়ায় কিছুই দেখা যায় না। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ শোনা গেল। জলধরের চীৎকারও বার দুই কানে এল। লোকজনের হৈ হৈ ছোটাছুটি বেশ খানিকক্ষণ চলল, কিন্তু কিছুই করা গেল না। কড়ি-জঙ্গলের অন্ধকারের আবক্ষ কর্দমের দুর্গমতা সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিল। খালের ধারে বিরাট কুমির ওত পেতে অপেক্ষা করে ছিল হতভাগ্য জলধরের পরকালের পরোয়ানা নিয়ে।

* * * *

সকালবেলা আটটা নাগাদ বেরিয়েছি একটা দূর গাঁয়ের ইস্কুল দেখবার উদ্দেশ্যে। প্রায় দুই ক্রোশ পথ মাঠের আল ধরে ধরে যেতে হবে। রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠবার আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবার ইচ্ছা। মাঝে মাঝে আল-পথ ছেড়ে

অসমতল চষা-মাঠের উপর দিয়েও হাঁটতে হচ্ছে। এ অঞ্চলের প্রধান চাষই হচ্ছে ধান। সারা মাঠই ধানের খেত। চাষী-গৃহস্থেরা সামান্য সামান্য আনাজের আবাদও করে। অন্য চাষ বড় একটা হয় না বললেও চলে। অসমতল মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। অনভ্যস্ত কিনা তাই কিছুটা মন্থরগতি। মাঝে মাঝে ঘন ঘাস—শিশিরভেজা—জুতো ভিজে যাচ্ছিল। কখনও পা ফসকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এদিকে সূর্যতাপ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠছে। হাঁটছি তো হাঁটছি—পথ যেন আর ফুরায় না। একটা সরু আলের উপর দিয়ে হাঁটছি—একটা বাঁক ঘুরতে হবে—সামনে এক ফালি জমি শুকনো ঘাস আর কাঁটা-গুল্মে আচ্ছাদিত। মাথায় চনচনে রৌদ্র লাগছে—বেশ একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হঠাৎ এই একঘেয়ে অস্বস্তির উপর যেন একটা ছেদ পড়ল। হাত দশেক দূরে শুকনো ঘাস হঠাৎ খুব জোরে আন্দোলিত হয়ে উঠল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—ফোঁস—এক বিরাট কালসর্প ফণা উদ্যত করে আমাদের গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এ-যে শঙ্খচূড়! সর্প-সম্রাট শঙ্খচূড়! কী ভীষণ সুন্দর এর রূপ—প্রকৃতির সৃষ্টি-শিল্পের কী অনুপম অভিব্যক্তি! মসৃণ নিকষ কালো দেহের উপর সাদা চুমকির কাজ—দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয়-সাত হাত—তদনুপাতে স্থূল। সাক্ষাৎ যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা জনকয়েক নির্জীব মানুষ। এই নির্জন প্রান্তরে এই বিষধরেরই একাধিপত্য—আমাদের অনভিপ্রেত ও অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে শঙ্খচূড়ের উর্ধ্বায়িত ফণা যেন ক্রুদ্ধ

প্রতিবাদ। সাধ্য কি এগুই! থমকে দাঁড়ালাম, পাদমেকং অগ্রসর হওয়া চলবে না এই কুপিত কালভুজঙ্গের দিকে। ফণা উদ্যত হয়েই থাকল মিনিট দুই—আমরাও এক পা এক পা ধীরে পিছু হটতে লাগলাম। তারপর বিদ্যুদ্বেগে বক্ররেখায় অদৃশ্য হয়ে গেল শঙ্খচূড় ঘাসভরা মাঠের মধ্য দিয়ে। একটা শঙ্কা ও অস্বস্তিতে আমাদের মন তখন আচ্ছন্ন।

সাপ মাত্রেই আক্রোশপরায়ণ জীব। কিন্তু শঙ্খচূড়ের আক্রোশপরায়ণতা অত্যন্ত বেশী। একটু সামান্য শব্দ, একটু ছায়া, মানুষের একটু আভাস মাত্রেই এর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। পূর্ণাবয়ব শঙ্খচূড়ের ফণার বিস্তার একটা কুলোর আয়তনের মতো। মাটি হতে প্রায় হাত দুই উঁচুতে যখন সেই উদ্যতফণা মহাভুজঙ্গ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তখনকার সেই ভীষণ মনোহর দৃশ্যের তুলনা হয় না! শঙ্খ-লাঞ্ছিত ফণায় সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে চক্ষু ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। অকুতোভয়ে সেই দৃশ্য চোখ ভরে দেখার সাধ্য কী!

সাগর-অঞ্চলের লোথিয়ান দ্বীপ সংরক্ষিত বনভূমি। বন-বিভাগের অনুমতি ব্যতীত লোথিয়ান দ্বীপের অভ্যন্তরে যাওয়া বা শিকার করা নিষিদ্ধ। সুন্দরবনের বহু অঞ্চল হতে লোক-বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য জীবজন্তুরা প্রায়ই বিদায় নিয়েছে। বেশীর ভাগ মানুষের হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়েছে, অনেক মরেছে আহারাভাবে, আর কতক অন্যত্র পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। লোথিয়ানদ্বীপে হরিণ, বাঘ, বুনো শুয়ার আছে, আর আছে বিশালবপু ময়াল ও চন্দ্রবোরা।

এখন সরকারী সংরক্ষণের দৌলতে এই নির্বংশপ্রায় জীবজন্তু-গুলির আবার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। লোথিয়ান দ্বীপে বড়ো বড়ো ময়াল সাপ দেখতে পাওয়া যায়। গাছের উপর মাচান বেঁধে বসে শখ করে অনেকে আবার রাত্রিতে বাঘের চলাফেরাও লক্ষ্য করে।

স্বাধীন ভারতে আজ বছর কয় যাবৎ বৃক্ষপালন এবং আরণ্য জীবন সংরক্ষণ বিষয়ে মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলবার একটা চেষ্টা চলেছে। মানুষের আদি সভ্যতা ছিল অরণ্যাশ্রয়ী। কাননকুন্তলা প্রকৃতির স্নিগ্ধচ্ছায়াঞ্চলেই মানুষের ভাব-ভাবনার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম কতো কাব্য-কাহিনী।

বিখ্যাত ইংরাজ শ্রমিক-নেতা মিঃ বিভানের উক্তি ঃ

Before the rise of modern industrialism it could be said that the main task of man was to build a home for himself in *nature*. Since then the outstanding task for the individual man is to build a home for him-self in society.

শিল্পমুখ্য সভ্যতা প্রসারের অবশ্যম্ভাবী অভিশাপ বনভূমির নির্মম বিনাশ। যেমনটি ঘটেছে আমেরিকায়, যেমনটি ঘটেছে ইউরোপখণ্ডে আর যেমনটি ঘটছে আজ ভারতবর্ষে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—তাই মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন

করছে। কলকারখানার বড় বড় ইমারত গড়ে উঠছে—জল-জঙ্গলময় স্থানগুলি বিনা শর্তে নতুন শহর-পত্তনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও কলকাতার আশেপাশের জলাগুলি ছিল নানা অসংখ্য বুনো জলচর পাখির স্বচ্ছন্দ বিহারভূমি। এখন রিফিউজি কলোনি স্থাপিত হয়েছে, তাই সেই বুনো হাঁসের দল, আর সেই গগনভেরী পাখিরা বড়ো একটা এ সব অঞ্চলে আসে না।

সভ্যতার অর্থই যেন আরণ্য প্রকৃতির উৎসাদন। এই ধারণাটা যে মানুষের পক্ষে কতো অকল্যাণকর সেই কথাটাই মানুষ আজ বুঝতে চেষ্টা করছে। তাই আবার অরণ্য-সৃজন (afforestation) ও বন্যজীবন সংরক্ষণ (wild life preservation) আন্দোলন অনুসৃত হচ্ছে। বিশ্ব-প্রপঞ্চের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতি ঘটনার ভিতরেই একটি অনিবার্য সত্য অহরহ প্রকট হয়—প্রকৃতি সাম্যের রাজ্য। যেমন গরম ও শীত, যেমন আলো ও আঁধার, যেমন শুষ্কতা ও আর্দ্রতা, যেমন ঋতু-চক্র—সব কিছুর মধ্যেই ব্যালান্স বা ভারসাম্যসূচক একটা অমোঘ নীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যালান্সকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে; যেমনটি ঘটেছে বেপরোয়া বনবিনষ্টি দ্বারা। বনজঙ্গল বিরল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে, জমির ক্ষয়-ক্ষরণ (soil erosion) বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ষড়্ ঋতুর আবর্তনে নানা বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। তেমনি বন্যজীবন

নাশের দ্বারাও মানুষ আজ যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে বোধটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ জাগছে। জন্তুজানোয়ারেরা মানুষেরই প্রতিবেশী। মানুষের সৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, মানুষের নীতি-শাস্ত্র, মানুষের প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ, মোটকথা মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অরণ্য ও আরণ্যজীবনের অবদান বড়ো কম নয়। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র থেকে শুরু করে এরোপ্লেন, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যন্ত্র-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ক্ষেত্রে নানা জাতীয় মনুষ্যেতর জীবজন্তুর আকৃতি-প্রকৃতি যে মানুষের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যায় কি ?

নিমতিঝোরা

সদর জেলা-শহর হতে প্রায় আশি মাইল দূরে ডুয়ার্সের অরণ্য-অঞ্চলে একটি চা-বাগান নিমতিঝোরা। পথের বাহন একটি মান্ধাতা আমলের পুরানো ফোর্ড গাড়ি। একটা গাট্টা জোয়ান ছোকরা বার কয়েক প্রাণপণ জোরে হ্যাণ্ডেলটা ঘোরাবার পর একটা ভীষণ ভট্‌-ভট্‌-ভট্‌ আওয়াজ করে আর গোটা দুই-তিন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট নিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বুড়ো ইঞ্জিনটার একটানা গোঙানি, গাড়ির ভিতরে ও বাইরে ধূলির অন্ধকার, স্প্রীং-বিহীন আসনের শক্ত পরুষ স্পর্শ আর মোবিল-পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ সব মিলে আশি মাইল পথ পরিক্রমাকে গোড়া থেকেই একটা বিভীষিকায় পরিণত করে তুলল। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো—একথাটার মর্ম উপলব্ধি করা গেল একটু পরেই। শহরের ভাঙা-চোরা বহু দিনের বে-মেরামত মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ছেড়ে, শীতের তিস্তার শুকনো বালুচরা ছাড়িয়ে গাড়ি ময়নাগুড়ির পথ ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যান্তর ঘটল। ডুয়ার্সের এ অঞ্চলটায় চা-এর আবাদ। আমরা চা-বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছি। চা-কোম্পানির দৌলতে এ অঞ্চলের মফঃস্বলের রাস্তা শহুরে মিউনিসিপ্যালিটির অনাদৃত রাস্তার চাইতে বহুগুণে ভালো।

পীচ-ঢালা সোজা সড়ক—বহু মাইল চলে গিয়েছে একটানা। গাড়ির ঝাঁকুনি কমে গেল বহুলাংশে, ধূলির উৎপাতও হ্রাস পেল, গাড়ির গতি হল অনেকটা স্বচ্ছন্দ। দু পাশেই চ-বাগান। একটা ছেদবিহীন দিগন্তবিস্তৃত সবুজের আস্তরণ সামনে, পিছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে। চায়ের গাছ স্বাভাবিক অবস্থায় উচ্চতায় আট-দশ হাত অবধি হয়। কিন্তু বাগানের চা-গাছ ক্রমাগত ছাঁটাইয়ের ফলে হয় বেঁটে ও ছড়ানো, —এতে পাতা জন্মায় বেশী। কচি পাতা শুকিয়েই তো চা প্রস্তুত হয়। বাগানের শ্রমজীবিনীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কচি কচি চা-পাতা আহরণ করে তাদের সাজি ভরে। সেই রাশি রাশি পাতাই কল ঘরের নানা প্রক্রিয়ায় সুগন্ধি লেবেল-আঁটা চায়ে পরিণত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দিন-মজুর-মজুরনীরা নিজ নিজ লাইনে চলে গিয়েছে। লোকজন বড় একটা চোখেই পড়ে না। দূরে দূরে চা-ফ্যাক্টরির বড় বড় লাল টিনের ঘরগুলি, কোথাও ম্যানেজারের সুন্দর বাংলা। বিচ্ছেদহীন সবুজের মাঝখানে এসব দেখাচ্ছিল বেশ। চা-গাছের চারাগুলিকে প্রখর সূর্যতাপের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যও বটে, আবার ঝরা পাতার রাশি মাটিতে পচে যাতে জমির উর্বরতা বাড়ায় সে জন্যও চা-বাগানে অসংখ্য শিরীষ গাছ লাগানো হয়ে থাকে। ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়াজড়ি মেশা-মেশি—একটা মস্ত বড় সবুজ চাঁদোয়া যেন ঢেকে রেখেছে গোটা বাগানটাকে। সূর্য তখন অস্তাচলের পথে।

ডাল-পাতার ফাঁকে দূর পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল। দেখা যায় সন্ধ্যাতারার সেঁজুতি। অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারদিকে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার গুঞ্জন শোনা যায় গাড়ি থামলে পর। অদূরে চা-বাগানের প্রান্ত ঘেঁষে ডুয়ার্সের বন। ক্বচিৎ বন্য শ্বাপদের চীৎকার কানে ভেসে আসে। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলে উঠল—সম্মুখের পথ খানিকটা উদ্ভাসিত হল সেই আলোকচ্ছটায়। ক্রমে বাগান ছাড়িয়ে অরণ্যভূমির ভিতর প্রবিষ্ট হলাম। অরণ্য, গভীর অরণ্য! নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র অন্ধকার। নৈশ অন্ধকারে বনভূমির সে এক নিথর আড়ষ্ট অবস্থা।

দিনের আলোতে বনভূমির যে রূপসজ্জা দেখেছি তার সঙ্গে এর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। দিবালোকে অরণ্য-প্রকৃতির কী মনোরমা মূর্তি! লাল-নীল-হলুদ-বেগুনী হরেক রঙের চুমকির কাজ-করা ফিরোজা বর্ণের আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। ফুলেরই বা কী বৈচিত্র্যময় সমারোহ! গাছে গাছে, ঘাসে ঘাসে কতো না নাম-না-জানা ফুল। দারজিলিং-এর পাহাড়ে পাহাড়ে দেখেছি ফুলের উৎসব। ডুয়ার্সের অরণ্য-উদ্যানও কম যায় না। বিশাল বনস্পতির দেহ ঘিরে প্রেমবিহ্বলা বেপথুময়ী তরুণীর মতো জড়িয়ে রয়েছে পুষ্পিতা লতিকা।

অশোকনির্ভতসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহমদ্যুতি কর্ণিকারম।
মুক্তকলাপি কৃতসিন্ধুবারম
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী॥

নাই বা থাকুক অশোক, কিংশুক, চম্পক, চামেলী প্রভৃতি আদরিণীর দল। মানুষের হাতের ছোঁয়া কোথাও লাগে নাই। কিন্তু অকৃপণা প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে তার বর্ণাঢ্য সম্পদ। বনে বনে ফুলের মেলা। বনজ ফুলের গন্ধ বড় একটা নাই, থাকলেও হয় ঝাঁঝালো নয় কটু। কিন্তু গন্ধের অভাব পূরণ করে দিয়েছে বর্ণ-সমারোহ। গাছপালারই বা কী অপরূপ বর্ণ-বিন্যাস—হরিৎ, ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, ধূসর। গভীর অরণ্যভূমি দ্বিভাষী। দিবালোকে শতসহস্র বিহঙ্গের কলকণ্ঠে অরণ্যের এক ভাষা উচ্চকিত হয়। আর তিমিরময়ী রজনীর নৈঃশব্দ্য অরণ্যের অপর ভাষা। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে সমগ্র বনভূমিকে গ্রাস করে নেয়। প্রকৃতির সে এক গম্ভীর তপোময় মূর্তি। নিশীথ অরণ্যের মর্মবাণী কানে শোনা যায় না—তাকে উপলব্ধি করতে হয় হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে। অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন শব্দহীন বনভূমির নিবিড় সর্বগ্রাসী স্পর্শ সমগ্র সত্তাকে এক অননুভূত মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

চলন্ত গাড়ির ভিতর ড্রাইভার ছাড়া আমরা পাঁচজন আরোহী প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে মৌন বসে আছি—যেন কোন আসন্ন সম্ভাবনার সুনিশ্চিত প্রতীক্ষায়। হঠাৎ সমতল পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা কাঁচা সড়কে এসে পড়ল। রাস্তা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে একটা শুকনো নালার ভিতর ঢুকেছে। গাড়িটাও নিচে নামল। নালা পার হয়ে অন্য গীয়ারের জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িটা ওদিককার ঢালু পারের উপর গিয়ে উঠল।

হেডলাইটা ধক্-ধক্ জ্বলছে। গাড়ির গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। সামনে প্রতিবন্ধক! দু-পাশে দীর্ঘ জমাট ঘাসবন—যাকে বলে এলিফ্যাণ্ট গ্রাস্। পিছনে ফেরার উপায় নাই। সামনে ওটা কী! যতদূর দেখা গেল একটা কৃষ্ণবর্ণ অতিকায় কোন জন্তু গোটা পথটাকে জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জন্তুটা যেন স্থির অচঞ্চল। অনুমানে হাতি বলেই প্রথমটা মনে হয়েছিল। তা হলেও সমূহ বিপদ—যদি তাড়া করে আসে তবে নিরুপায়। গাড়িটাকে সামনে বা পাশে চালাবার পথ নেই। পিছনে নালার গভীর খাদ—গাড়ি ঘোরাবারও উপায় নেই। চকিতে মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। প্রত্যক্ষ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরকম বিষম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। গাড়িটাকে ফেলে যদিও বা পালাই, গাড়িটার কী দশা হবে? দলে মুচড়ে গাড়িটাকে আস্ত রাখবে না নিশ্চয়ই বুনো হাতিটা, বিশেষতঃ দুশমন মানুষ হাতছাড়া হয়ে গেলে। এ অঞ্চলে এই সময়টা বুনো হাতির উৎপাত দেখা যায়।

এই সেদিনও নাকি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হিন্দুস্থানী মজুরেরা এসেছিল রাস্তা, পুল মেরামতের কাজে। তারা ডেরা বেঁধেছিল বনের একটা অংশে। একসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশটা ডেরায় শতাধিক লোক থাকে। রাত্রিবেলা বন্য জন্তুর ভয়ে ডেরাগুলির সামনে আগুনের কুণ্ড জ্বালায়—বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুড়তে থাকে সারা রাত। নেকড়ে, হাতি, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুরা আগুন দেখে ভয় পায়, ডেরার ধারে কাছে ঘেঁসে না। এক রাত্রে সারাদিনের মেহনতের পর মজুরের দল

ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে আগুনের ধুনি ঠিকই জ্বলছিল, কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় আগুন নিভে গেল। শেষ রাত্রির দিকে ডেরায় ডেরায় হুলস্থুল পড়ে গেল। বুনো হাতির দল ডেরার উপর চড়াও হয়েছে। ঘুমের চোখে বিপন্ন মানুষ যে যে দিকে পারল ছুটে পালাল। রক্ষা পেল সবাই বাদে একজন। পালাতে গিয়ে পড়ে গেল একটা বুনোর সম্মুখে। ফুটবলে লাথি মারার মতো বুনো হাতিটা সে হতভাগ্যকে গোদা পায়ের এক ঠেলায় চল্লিশ হাত দূরে একটা গাছের গুঁড়িতে নিক্ষেপ করল। তাতেই কি নিস্তার আছে। হাতির আক্রোশ বড় মারাত্মক। তেড়ে গিয়ে ঢুঁ মেরে বেচারাকে আধমরা করে ছাড়ল। এদিকে মানুষের চীৎকারে হাতির দলও হকচকিয়ে অন্যদিকে সরে পড়ল। কিন্তু সে হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটল অতি শোচনীয়ভাবে। হাড়গোড় একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

* * *

আমাদের গাড়ির হেডলাইটটা জ্বলতেই লাগল। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর বোঝা গেল ওটা হাতি নয়, একটা অতি বৃহদাকার গণ্ডার। গাড়িটার দিকে পিছন ফিরে পাশের ঘাসবনে আহার আহরণে রত। এ অবস্থায় হর্ন বাজানো নিরাপদ নয়। নিঃশব্দে হেডলাইট জ্বালিয়ে বসে থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু গণ্ডার-পুঙ্গব যে অনড়, অচল ও ভ্রূক্ষেপহীন। বেশ খানিকক্ষণ পর গণ্ডার-প্রভু তার বিপুল স্কন্ধটি ঈষৎ বেঁকিয়ে একটা অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে সশব্দে পাশের ঘাসবনে

অদৃশ্য হয়ে গেল। ফাঁড়া কাটল। আমাদের ধড়ে আবার প্রাণ ফিরে এল।

আর একদিনের ঘটনা। পর পর পাঁচখানা গো-গাড়ি চলেছে। এবারে আর মোটর নয়। গো-গাড়ির ক্যারাভান চলেছে একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে। দিনেই হোক বা রাত্রেই হোক দলবদ্ধ হয়ে বনপথ অতিক্রম করাই যুক্তিসঙ্গত। দীর্ঘ পথ। অর্ধপথ শেষ না হতেই নিবিড় ছায়া পরিব্যাপ্ত হল চতুর্দিকে। গাড়ির সামনে দিয়ে এক ঝাঁক জংলী মোরগ উড়ে গেল। তাদের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ বাতাসে মিলিয়ে না যেতেই দেখা গেল একটি নাতিবৃহৎ হরিণের দলকে। পথের এ পাশ হতে ওপাশে যাচ্ছে। জংলী মোরগগুলি হরিণের সাড়া পেয়েই বোধ হয় অকারণে অতর্কিত ভাবে প্রস্থান করল। হরিণগুলির কী স্থির সকরুণ দৃষ্টি। নিরীহতার মূর্ত প্রতীক। মানুষ হরিণের শত্রু—সেই মানুষকে এতো কাছে দেখেও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। অপলক কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মানুষের দিকেই। বনপথে হরিণ-শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য দেখা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়। অন্ধকারে মোটর গাড়ির হেডলাইটে চপল হরিণ-শাবকের নৃত্যলীলা উপভোগ্য জিনিস। একবার একটা হরিণ গাড়ির সামনে পড়ে ছুটতে লাগল। গাড়ির গতি যতোই বাড়ে, হরিণও ততোই দ্রুত ছুটতে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা এইরূপে ছোটার পর হরিণটা পাশের বনে ঢুকে গাড়িটাকে সাইডিং দিল।

হরিণের পর বাঘের পালা। সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রিতে পরিণত

হল। রাত্রি গভীর হতে লাগল। পথ যেন আর ফুরায় না। গাড়িগুলি ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। সুষুপ্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত। ক্বচিৎ দূর বনপ্রান্ত হতে কোন নিশাচর পাখির ডাক শোনা যায়। গোগাড়ির চাকার একঘেয়ে কঁ্যাচ-কঁ্যাচ আওয়াজ আর গাড়ি চলার ঈষৎ আন্দোলন, গোগাড়ির ছইএর অভ্যন্তরে খড়ের গাদায় সতরঞ্চি বিছানো, শুয়ে শুয়ে একটু তন্দ্রার আবেশ এসেছিল। সে আবেশটুকু কেটে গেল হঠাৎ! গাড়ি থেমে গিয়েছে, গোরুগুলি আর এগুতে চায় না—ছটফট করছে, যেন দড়ি ছিঁড়ে কোন দিকে পালাতে চায়। কিন্তু তখন আর ফেরবার জো নেই। খুব বেশী দূরে বলে বোধ হল না একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন। অবধারিত বাঘ। বাঘের থাবার দাগ দেখে ব্যাঘ্র-বিশেষজ্ঞরা অনেক সময় বাঘের বয়স ও আকৃতি ইত্যাদি ঠিক করতে পারেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাঘ্র-বিশেষজ্ঞ কেউ ছিল না, সেরকম পর্যবেক্ষণের সুযোগও কিছুমাত্র নাই। গো-গাড়ির আরোহী আমরা কয়জন সবাই নিরীহ গোবেচারী বাঙালী সন্তান—

ভদ্র মোরা শান্ত অতি পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।

বাঘের মুখোমুখি হওয়া দূরের কথা, বনে বাঘ গর্জাচ্ছে, তাতেই প্রাণান্তক অবস্থা। যাকে বলে "হর্স সেন্স"—মানুষের চাইতে গাড়ির বলদগুলিরই বেশী পরিমাণে আছে। গোরুগুলি বিপদের আভাস পেয়েছে পূর্বেই এবং পাদমেকং এগুতেও নারাজ। গাড়ির চালকেরা অগত্যা গাড়ি হতে অবতরণ করতে বাধ্য

হল। অনেক বকা-ঝকা, হৈ হৈ রৈ রৈ করা গেল। সাময়িক ভাবে ক্রুদ্ধ গর্জনটা থামল। গোরুগুলিও নাসিকা-রজ্জুর আকর্ষণে চালকের পিছু পিছু চলতে বাধ্য হল। কিন্তু হৈহৈ রৈরৈ থামলেই আবার সেই গর্জন-ধ্বনি। এই অবস্থায় আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করা গেল। মনে হল পথ হতে খানিকটা যেন ব্যবধান রক্ষা করে বাঘটা সমান্তরাল ভাবে গাড়ির গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। কী বিপদ! বাঘটার মতলব যে বেজায় খারাপ — গাড়ির গোরু ও মানুষগুলির দিকেই তার নজর—সে কথা বুঝতে আর দেরি হয় না। প্রাণপণে সব্বাই চীৎকার করতে লাগলাম—যতক্ষণ চীৎকার করি অপর পক্ষ চুপ থাকে। আমাদের চীৎকার থামলেই আবার সে পক্ষের নীরবতা ভঙ্গ হয়। ভাগ্যিস রব ও প্রতিরবের উপর দিয়েই এ যাত্রা প্রতিযোগিতা শেষ হল। ডাকাডাকির অধিক অন্তরঙ্গতা হয় নি তাই রক্ষা।

গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছানো গেল তখন বেশ রাত্রি হয়েছে। লোকালয়ের সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েই সেই অনভিপ্রেত পার্শ্বচরটি সরে পড়ল। সে রাত্রির অভিযান তার একেবারেই নিষ্ফল গেল।

*   *   *

নিমতিঝোরা। এক দেশী চা-বাগান। মালিকেরা থাকেন কলকাতায়, নয় জিলার সদর শহরে। মুনাফার মোটা অঙ্ক জমা হয় ব্যাঙ্কের খাতায়—বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগৃহীত হয়, বাবুগিরির ঠাট চলে বেশ। মাঝে মাঝে মালিকেরা সরেজমিনে

বাগানে আসেন। একটা ধূম পড়ে যায়। বাগানের গেস্ট-হাউসটা দেখবার মতো। আধুনিক আরাম-আয়েসের কোন আয়োজনেরই ত্রুটি নেই। ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার এবং আরও অনেকে তদ্বির তদারক করেন—বাবুদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। ম্যানেজার মহাশয় স্মিতহাস্যে আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানালেন, নিয়ে গেলেন সেই শৌখীন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গেস্টহাউসে। থাকবার, খাবার, অবসর-বিনোদনের কোন উপকরণেরই অভাব নেই। উর্দিপরা খানসামা হুকুম-মোতাবেক হাজির। রেফ্রিজারেটরে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য নানাবিধ আহার্য পূর্ব হতেই সংরক্ষিত আছে। এই নিভৃত দুর্গম ডুয়ার্স জঙ্গলের চা বাগানের গেস্ট হাউসে বসে কলকাতার নিউ মার্কেটের আমদানি নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করছি—কথাটা ভাবতেও পুলকে রোমাঞ্চ হয়। তারপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা, নেটের মশারি, মস্তকোপরি ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রিক পাখা—এ পরিবেশে ঘুম না এলে অনিদ্রা রোগের চিকিৎসা করাই বিধেয়।

মন্বন্তর ও মহাযুদ্ধ এ দুয়ের একটু আঁচও ইংরাজ প্রভুরা চা-বাগানগুলির গায়ে লাগতে দেন নি। চা একটা আন্তর্জাতিক পানীয়। যুদ্ধকালীন চায়ের চাহিদা মেটাবার জন্য ইংরাজ শাসকবৃন্দ চাবাগানগুলিকে খাদ্য-বস্ত্র অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অবাধ সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিল। যে সময় বাংলা দেশে চালের দাম উঠেছিল ৪০।৫০৲ টাকা আর কাপড়ের দাম উঠেছিল জোড়া-প্রতি ১৬।১৭৲ টাকা সে সময়েও চা-বাগানের বাবুরা ৭৲ টাকা মন চাল ও ৬৲ জোড়া

কাপড় পেত। আর মালিকদের মুনাফার অঙ্ক উঠতে উঠতে কোথায় উঠেছিল তার আভাস পাওয়া যেত তাদের অহরহ বিমান-ভ্রমণ ও চালচলনের জঁাকজমকে।

যুদ্ধোত্তর কালে সারা দুনিয়াতেই জীবিকা-নির্বাহের ব্যয়ভার অসম্ভব বেড়েছে। আর তার ফলে সব চাইতে অসুবিধাগ্রস্ত হয়েছে নির্দিষ্ট বেতনভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী। আর সবার চাইতে লাভবান হয়েছে মুনাফাখোর বড় বড় ব্যবসায়ীরা। দেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে বিদেশী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এদেশে সঙ্কুচিত করা হয়েছে রক্ষামূলক শুল্ক প্রবর্তন করে, অথবা বৈদেশিক আমদানি বন্ধ করে। তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে দেশীয় বড় ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা। একবার রব উঠল চা-এর বাজার বড় মন্দা, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যুদ্ধকালীন শতকরারও উর্ধ্বে যে পরিমাণ মোটা মুনাফা হচ্ছিল তার কিঞ্চিৎ লাঘব ঘটেছে। তাই চিৎকার উঠল গেল গেল, সব গেল। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের সার্থকতার পথে আজ একটা বড় বিঘ্ন হচ্ছে এই যে, জাতীয় সম্পদ জনকয়েক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির কুক্ষিগত। ধনোৎপাদনের মতো ধনের সমবণ্টনও বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

* * *

নিমতিঝোরায় দুদিন ছিলাম। বেশ কাটল। সুখকর বিশ্রাম, ভাল খাওয়া-দাওয়া, প্রভূত পরিচর্যা, আর যদৃচ্ছ মোটর বিহার—আর কী চাই। আধুনিক যুগের বস্তুতান্ত্রিক মানুষের যা কাম্য সবই তো জুটল—তাও আবার সম্পূর্ণ

নিখরচায়। এক সন্ধ্যায় নাচগানের আসর জমল। কল-ঘরের সামনের প্রশস্ত মুক্ত চত্বরে বাগানের শ্রমজীবী আর শ্রম-জীবিনীরা জমায়েত হয়েছে শয়ে শয়ে কাতারে কাতারে। অধিকাংশই সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভীল ইত্যাদি শ্রেণীর—দক্ষিণ বিহার বা উড়িষ্যা অঞ্চলের। ভাষা মিশ্রিত। মিশ্রিত বাঙালী থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু খাঁটি বাঙালী বোধ হয় নেই।

কুহরী নাচছে। নিকষ কালো পাথরের খোদাই নিখুঁত একটি জীবন্ত ভাস্কর্য-মূর্তি। সুগঠিত অবয়ব, মূর্তিমতী স্বাস্থ্য—নৃত্যের ছন্দে ছন্দে লীলায়িত দেহভঙ্গিমা বিহ্বল করেছে দর্শকবৃন্দকে। একক ও যৌথ উভয় প্রকারের নাচই চলল বহুক্ষণ ধরে। নৃত্যশিল্পের বিজ্ঞানসম্মত আঙ্গিকের ধার হয়তো এরা ধারে না এবং জানেও না। কিন্তু এদের নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অকপট অভিব্যক্তি। নাচ-গানের ভিতর দিয়ে এরা যেন বেঁচে থাকার আনন্দটুকু দুহাতে লুঠে নিতে চায়। এরা অপরের হাততালি বা বাহবার প্রত্যাশায় নাচে না। বনের পাখি যে কারণে কূজন করে বা বৃক্ষশাখায় পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচে ঠিক সেই সহজ আনন্দানুভূতির আবেশেই এরা গান গায় ও নাচে।

নাচের সাথে সাথে বাজনাও চলেছে অবিরাম। বাজনা নানা রকমের। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল-মাদলই প্রধান। অনেকগুলি লোক বাজনা বাজাচ্ছে, সানাইও রয়েছে। নাচ জমে আসছে। দর্শকবৃন্দ আবেগের আতিশয্যে মুখে নানা

শব্দ করে বাজনার আওয়াজকে আরও উচ্চকিত করে তুলছে। তুমুল কোলাহল—যুগপৎ গান, বাজনা, নাচ, গালবাদ্য ও বাহবা-ধ্বনি। যেন

শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয় ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী ঢাক ॥
উরমাল টিকারা বাজে কোটি কোটি ডঙ্ক।
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবন কম্প ॥

কুহরীর নাচ আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দর্শকবৃন্দের চোখে লেগেছে মাদকতার নেশা, মনে লেগেছে পুলকের দোলা। নর্তকীর প্রতি অঙ্গ নৃত্য-চাঞ্চল্যে লীলায়িত।

ঢোল-মাদল-সানাই-বাঁশির ধ্বনি আরও উচ্চগ্রামে উঠেছে। রাতও বেশ হয়ে এল—দর্শকবৃন্দের কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি নেই। আরও বহুক্ষণ নাচ-গানের আসর চলবে। কুহরীর নৃত্যই প্রধান আকর্ষণ।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,

উদ্যতফণা কৃষ্ণসর্পিনীর মতোই তার ভীষণ আকর্ষণীয় রূপ। সে রূপ-বহ্নিতে কতো লুব্ধ পতঙ্গই না আত্মাহুতি দেয়! নাচের আসর হতে বিদায় নিলাম। বিশ্রাম-শয্যায় শুয়ে অনেক রাত অবধি দূরাগত বাদ্যধ্বনির আমেজটুকু উপভোগ করতে লাগলাম।

*   *   *

বেশ লাগল নিমতিঝোরা। আজও সেই পেছনে-ফেলে-আসা দিন কটির কথা স্মরণ করলে মনে আনন্দের অনুভূতি জাগে।

তৃতীয় শ্রেণী

কথাটাই প্রোলিটারিয়েট-গন্ধী। কোনকিছুর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে হলেই আমরা সচরাচর বলে থাকি "থার্ড ক্লাশ।" যিনি প্রথম থার্ডক্লাশের অভাজনত্ব ঘুচিয়ে একটা নৈতিক আভিজাত্যের ছাপ এর গায়ে এঁটে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন স্বনামসিদ্ধ মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী রেলের থার্ড ক্লাশে চড়তেন। তাঁর চেলাচামুণ্ডারাও অনেকেই হয়েছেন তাঁর অনুবর্তী। আমরা গান্ধীজীর চেলা না হয়েও থার্ডক্লাশগামী, অবশ্য নিজের পয়সায়। এদেশে প্রথম রেল-গাড়ির চল হয়,—সে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। কবি হেমচন্দ্র উল্লাসভরে রেলগাড়ির প্রশস্তি রচনা করেছিলেন :

"এসো কে বেড়াতে যাবে শীঘ্র কর সাজ ;
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ ত্বরা করি
বাক্স ব্যাগ তল্পি ধরি ;
এখনি বাজিবে বাঁশি
ঠং ঠং ঠং কাঁশি,
গর্জিবে ইস্পাৎ বোলে,
ছাড়িবে নিশান-কোলে,

শীঘ্র উঠ, পড়ে থাক্ ছড়ি ঘড়ি, তাজ।
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।”

রেলগাড়ির চাইতেও তীব্রতর বেগে আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ রেলগাড়ির যুগকে পিছনে ফেলে আমরা এরোপ্লেনের যুগে এসে পড়েছি। আজ হেমচন্দ্র বেঁচে থাকলে হয়তো এরোপ্লেনের প্রশস্তি লিখতেন। কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস আছে যা হাজার পুরানো হলেও সহজে ছাড়া যায় না। যেমন গোরুর গাড়ি। দেশের কাঁচা রাস্তাগুলি ক্রমশঃ পেকে উঠেছে, মোটর গাড়ির সংখ্যাও হু হু বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই আদ্যিকালের গোরুর গাড়িকেও আমরা ছাড়তে পারি নি।

ধান-ছাঁটা কলে দেশ ছেয়ে গেছে—কিন্তু ঢেঁকির দুমদাম এখনও পাড়াগাঁয়ে কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের প্ল্যানিং কমিশন আবার ঢেঁকি-প্রচলনের পক্ষপাতী। বুল-ডোজার ও ট্র্যাক্‌টর দিয়ে বড় বড় খামার চাষ করার রেওয়াজ বাড়ছে। আবার একদল লোক বলছে বলদ-লাঙলের চাষই নাকি মোক্ষম। জাপানীরা ট্র্যাক্‌টর দিয়ে চাষ করে না,— তারা চালায় ঘোড়ার লাঙল। যাক এক কথায় আর-এক কথা এনে লাভ কি! রেলগাড়ির কথাই বলা যাক। এরো-প্লেন-হেলিকোপটারের যুগেও রেলগাড়ির পশার কিছুমাত্র কমবে না। রেলগাড়ির রোমান্স হাজার এরোপ্লেনেও বিন্দু-মাত্র হ্রাস করতে পারবে না, চিরদিনই অটুট থাকবে।

রেল-ভ্রমণ যে কতো রোমান্টিক তা বোঝা যায় একমাত্র থার্ড ক্লাশে ট্র্যাভেল করলে। থার্ড ক্লাশে গদি নাই, ফ্যান

নাই। আছে শুধু গাদাগাদি মানুষ, আর আছে সত্যিকারের রোমান্স, আছে অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের বিরাট অবকাশ। মহাত্মা গান্ধী থার্ড ক্লাশে চলাফেরা করে মানুষকে থার্ড-ক্লাশানুরাগী করে দেশের একটা মহৎ উপকার সাধিত করে গেছেন! ফার্স্ট ক্লাশ বা এয়ারকণ্ডিশণ্ড কোচে ট্র্যাভেল করে চাল বজায় রাখা যায় বটে, কিন্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা মজার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকতে হয়। আবার সময়ভেদে থার্ড ক্লাশে চড়ার মজারও প্রকারভেদ ঘটেছে। এদেশে প্রথম রেলগাড়ির চলন হওয়ার পর রেল কর্তৃপক্ষ থার্ড ক্লাশে পায়খানা রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁরা মনে করতেন থার্ড-ক্লাশগামী যাত্রী মাত্রেই রুদ্ধদ্বারইন্দ্রিয়সংযমী প্রায়োপবেশনকারী। শুনেছি যাঁরা সেকালে থার্ড ক্লাশে চড়ে নাগপুর থেকে কলকাতা আসতেন কিংবা কলকাতা থেকে নাগপুর যেতেন, তাঁরা রেলে চড়বার আগে জোলাপ নিয়ে অন্তরশুদ্ধি করে নিতেন, তারপর পুরো একদিন থাকতেন নিরম্বু উপবাসে। কারণ থার্ড ক্লাশে কোন পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। সে সব দিন অবশ্যি বহুদিন বহুদূরে চলে গেছে। বহুকুখ্যাত লর্ড কার্জন এদেশে ভাল মন্দ এমন অনেক কিছুই করে গিয়েছেন, যার জন্য তাঁর নামটা অনেক সময়েই ইতিহাসের পাতা ঘাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ে। থার্ড ক্লাশের যাত্রীদের জন্য পায়খানার ব্যবস্থা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। আবার খানিকটা বাজে কথা বলা হয়ে গেল। যাক এইবার সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক।

দারজিলিং থেকে নামছি। নানা কারণেই মেজাজটাও একটু চড়া। যেন কতো বড়ো একটা কাজেই না করে এসেছি। এজন্য সঙ্গদোষও খানিকটা দায়ী। কলকাতার সে সব বাবুসায়েব আর মেকী মেমসায়েব দারজিলিং যান, তাঁদের হাবভাব ও চালচলনের অলক্ষ্য প্রভাব নিরীহ গোবেচারীর মাথায়ও ভূতের মতো চেপে বসে। দারজিলিংএর ঠাণ্ডায় মাথা ঠাণ্ডা হওয়া দূরে থাকুক, তাতটা যেন একটু বাড়িয়েই দেয়। একেই বলে বিপরীত দ্রব্যগুণ অনেকটা চায়ের বিজ্ঞাপনের মতো,—ঠাণ্ডায় গরম রাখে, গরমে ঠাণ্ডা। কিন্তু শিলিগুড়িতে নেমেই সে দারজিলিঙী মৌতাত যেন অনেকখানিই ছুটে গেল। কারণটা বলি।

ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট আগে থাকতেই কেনা ছিল এবং আনুষঙ্গিক বার্থ-রিজার্ভেশনও যথাযথ করাই ছিল। তবু একটা অঘটন ঘটল। স্টেশনে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলাম অনিবার্য কারণে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। সব রিজার্ভেশন নাকি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। স্টেশন-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ উপরোধ যথেষ্ট করলাম, কিন্তু তাঁরা অটল অনড়। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো বোধ হল। বুকিং অফিসে সমাসীন জন দুই বৃহৎ-বপু চাবাগানের মালিক যেন অবজ্ঞানুকম্পা-মিশ্রিত দৃষ্টিতেই আমাকে ব্যঙ্গ করছেন। ভাবটা, আরে ফেলো কড়ি মাখো তেল! স্পেশাল কেস সব সময়েই হয়, তবে ট্যাঁকের পয়সার মায়া ছাড়তে হবে! ছা-পোষা সরকারী চাকুরে! স্বাধীন ভারতের অধমাধম জীব। ট্যাঁকই নেই,

তা ট্যাঁকের পয়সা! প্রচ্ছন্ন টাকার খোঁটা নীরবে ও নেহাত অহিংস ভাবেই হজম করতে হল। কিন্তু তাগিদ বড় বালাই। যেতে আমাকে হবেই—রিজার্ভেশন পাই বা না পাই। মনে মনে একটা সাধু সঙ্কল্প জেগে উঠল। স্বাধীন ভারতের স্বয়ংসিদ্ধ নাগরিক,—যে কোন অবস্থার জন্যই তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুচ্ছ রিজার্ভেশনের অজুহাতে অমূল্য চব্বিশঘণ্টা কাল বিলম্বিত হওয়া তার শোভা পায় না। এই শুভ সঙ্কল্পকে আরও জোরালো করে তুলল মহাত্মা-প্রদর্শিত থার্ডক্লাশ-মাহাত্ম্য। মনস্থির করে ফেললাম,—কুচপরোয়া নাই থার্ডক্লাশই সই। মেলগাড়িতে ভিড় অত্যধিক! ধীরগামী একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি প্ল্যাটফরমেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার সব কটা কামরাই তৃতীয় শ্রেণীর। আদর্শ শ্রেণীবিহীন রাষ্ট্রের জ্বলন্ত না হলেও চলন্ত প্রতীক। গাড়িটার লেজের দিকে গার্ড সাহেবের গাড়ি-সংলগ্ন একটি ছোট কামরায় উঠে পড়লাম। সেখানে প্যাসেঞ্জারের ভিড় অপেক্ষাকৃত হালকা। সারাটা রাত কাটাতে হবে। ভাবলাম মন্দ হল না, একটু হাত-পা ছড়িয়ে সময়টা কাটানো যাবে। জনৈক সহযাত্রী আশ্বাস দিলেন,—সামনের গাড়িতে ভিড় হলেও এদিকটা ফাঁকাই থাকবে। মনে মনে একটু সান্ত্বনার ভাব নিয়েই গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়িও ছাড়ল। শিলি-গুড়ি ছেড়ে গাড়ি যতই কিষাণগঞ্জ-কাটিহারের দিকে এগুতে লাগল ততই ক্রমশঃ গাড়ির ভিতরকার কম্‌প্লেক্‌শন্ বদলাতে লাগল, অর্থাৎ বাঙালীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হল। হিন্দিভাষী ভায়ারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে লাগল।

আমাদের হিন্দুস্থানী দেহাতী ভাইয়াদের ভারি একটা মজার রীতি আছে! স্টেশনে গাড়ি থামলে দেখা যায় যত যাত্রী সব প্ল্যাটফরমের একটা জায়গায় জমায়েত হয়ে আছে, আর ঠিক সামনে যে কামরাটা পড়বে সবাই বন্যার স্রোতের মতো সেই দিকেই ধাওয়া করছে। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম ঘটে,—বেশ চমৎকার Community action। এখন প্ল্যাটফরমের যে দিকটায় যাত্রী-জমায়েত থাকবে সেই দিককার কামরাগুলির উপরেই পড়বে সবটা ঝুঁকি। এই রকম একটা বড় ঝুঁকি এসে পড়বি তো পড় আমার কামরাটায়। আর যায় কোথা,—'সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার!' একটা হট্টগোল পড়ে গেল। সচকিত, ভীত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসতে হল! এ-ভাইয়া হো, এ-রামা হো, এ-সহদেব রে—এক পক্ষের আহ্বান। প্রতিপক্ষের জবাব, ক্যা ভৈল রে! গাড়ির গায়ে লেখা আছে "২৫ জন বসিবেক।" হলপ করে বলতে পারি চার-পচিশং,—বেশী বই কম নয়! যে সংখ্যক লোক তার দেড়া পরিমাণ "সামান"। আমার আশে পাশে সামানের স্তূপ! এক দেহাতী প্রায় আমার গায়ের উপরেই এসে পড়ে আর কি,—হাতে চট-জড়ানো একটা খাঁচার মতো কী! চটের খাঁচাটা অশ্রান্ত একটানা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—"ইস্‌মে চিড়িয়া হ্যায়।" একটা ময়না-টয়না হবে আর কি! খানিক বাদে আবার ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁর সঙ্গে মিলিত হল ক্রুক্ ক্রুক্ ক্রুক্ শব্দ! বুঝলাম চিড়িয়া একটি নয়—এক জোড়া! ততক্ষণে গাড়ি

ছেড়ে দিয়েছে। কেবল চিড়িয়াই নয়, এতোক্ষণ লক্ষ্য করি নি, এইবার করলাম। অদূরেই আর-এক ভেলকি। এক বান্দর-ওয়ালা, সঙ্গে দুইটা বান্দর। বান্দরওয়ালা কালক্ষেপ না করে হাতের প্রবল সঞ্চালনে ডুগডুগি বাজাতে শুরু করে দিয়েছে—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্............। এর উপর আবার পান-বিড়ি-সিগ্রেট। সব মিলে শব্দ-ব্রহ্ম বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন। বান্দরওয়ালা গান ধরল—"আরে মেরী জান্।" আমি অবাক বিস্ময়ে বসে আছি! পরিধানে প্যাণ্টকোট। তাই পরিচ্ছদের মহিমায় তখনো পর্যন্ত আসনচ্যুত হই নি। পিছন ফিরে দেখি কাপড়ে-মোড়া আর একটি সামান ঠিক আমার শিয়রে,—ঈষৎ সঞ্চরমাণ,—বুঝলাম পর্দানশিন আওরত। সারা কামরাটা গমগম করছে। মস্তকোপরি বাঙ্কে সমাসীন যারা,—তারা কেউ খৈনি টিপছে, কেউ ঈষৎ নিমীলিত-নয়ন, কেউ সঙ্গীতমুখর। উৎসাহেতে ধোপার গাধাও গান গাইতে পারে। আর এই রকম একটা অনুকূল পরিবেশে যাত্রীদের সঙ্গীতপ্রবণতা যে প্রবল হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! বেশ যাচ্ছি, ঝকর-ঝকর রেলগাড়ি চলেছে,—হঠাৎ যেন তাল কেটে গেল। পরুষ কণ্ঠে কেউ জিজ্ঞাসা করল, "এ টাট্টি নাহিল বা!" সত্যি তো গাড়িতে কোন পায়খানার বালাই নাই। কার্জনী আমলের পূর্বেকার ব্যবস্থা! পরের স্টেশনে গাড়ি যখন থামল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে কিন্তু কামরায় বাতি নাই। নেমে গার্ড সাহেবকে বাতির কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি অতি বিনয় সহকারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে নিজের কামরার হেজাক্

লাইটটি দেখিয়ে দিলেন। সারাটা ট্রেনের কোন কামরাতেই বাতির ব্যবস্থা নাই,—এক গার্ড সাহেবের হেজাক বাতিটা ছাড়া। প্রয়োজনমত যাত্রীরা অনেকেই গাড়ি থেকে নেমে এদিকে ওদিকে নিত্যকর্মটি সেরে নিচ্ছে।

তখন রাত প্রায় একটা। বসে বসে একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ তন্দ্রার আবেশ কেটে গেল,—মনে হল কামরাটায় আমি একা। নিতান্তই আমি একা! আর সকলেই কখন নেমে গেছে কিছুমাত্র টের পাই নি। একটা মাইকের ঘোষণা কানে এসে পৌঁছাল। Due to engine-trouble the Passenger train may be delayed for two to three hours. Passengers may please alight and take the mail train coming shortly.

কাটিহারে এসে এই বিভ্রাট। এইবার বুঝলাম কামরা কেন ফাঁকা। কিন্তু নিরুপায়। মাঝরাতে বদ্ধার্গল মেলট্রেনের কামরায় ঢোকে সাধ্যি কার। যা থাকে কপালে—ঠায় বসে রইলাম।

আবার ঝিমুনি শুরু হল। তন্দ্রা যখন ভাঙল, গাড়ি মনিহারি ঘাটে এসে পৌঁছেচে। ইঞ্জিনের ঝামেলা সহজেই মিটেছিল, বুঝা গেল। গাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য কিছু পরেই ঘাটে এসে পৌঁছেচে। একেই বলে the price of patience, সবুরে মেওয়া ফলে।

ওপারে সক্‌রিগলি ঘাট। কলকাতাগামী বড় গাড়ি অপেক্ষমাণ। পকেটে ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট। আর তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে না ভেবে মনে মনে বেশ একটু হ্লাদিত বোধ

করলাম। যথাসময়ে সক্‌রিগলি পৌঁছানো গেল, সব কিছুই যেন অনুমানমাফিক হয়ে আসছে। বিগত বিনিদ্র রজনীর কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলব, এই সঙ্কল্প নিয়ে ফাঁকা দেখে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করা গেল। কামরায় তুটি বার্থ ও তুটি বাঙ্ক। বাঙ্ক তুটিই মালে ঠাসা, মেঝেতেও মালপত্র কিছু কিছু ইতস্ততঃ ছড়ানো। কিন্তু এতে আমার বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমি হালকা ভ্রমণের পক্ষপাতী। সঙ্গে মালপত্রের বালাই বিশেষ কিছু নেই, অনেকটা কম্বল-সম্বল ভাব। একধারের বার্থে এক গোবেচারী-দর্শন প্রৌঢ় দম্পতি,—অন্য বার্থটি একেবারেই খালি। যাক বাঁচা গেল! গভীর আশ্বাসে ঐ ফাঁকা বার্থটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে নিজ দখল জারি করলাম। কিন্তু আশা ছলনাময়ী, এই মহাসত্যের মর্ম অনতিকাল পরেই উপলব্ধি করতে পারলাম। একটু বাথরুমে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেই দেখি পেল্লায় কাণ্ড! আমার সতরঞ্চি বেদখল,—কামরায় ন স্থানং! সেই প্রৌঢ় দম্পতির বংশদীপালি,—সংখ্যায় পুরোপুরি এক ডজন, এজ্‌-রেঞ্জ আঠারো হতে তুই। হারাধনেরা এতোক্ষণ ছিল কোথায়! শুরু হল হৈচৈ তচনচ কাণ্ড! ছোট তুটো এখনো হামাগুড়ির বয়স কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এদের দৌরাত্ম্যই সব চাইতে বেশী। কর্তা ভদ্রলোকটি নেহাত গোবেচারা। একটু লজ্জিত ভাবে মার্জনা ভিক্ষার সুরেই যেন আমাকে কী বলবার চেষ্টা করতেই আমি ভালমান্‌ষি দেখিয়ে তাঁর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই বললাম, "না না কিছু না, তাতে কি।"

এর পর সেই ক্ষীণকায় ও ক্ষীণপ্রাণ ভদ্রলোকটি আর মুখ খুললেন না। পাঁচ ঘণ্টা একঠায় মুখ গুঁজে চুপটি করে বসে রইলেন। হৃষ্টাপুষ্টা গৃহিণী আকারে ও প্রকারে কর্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্তাটি হচ্ছেন নীরব ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ আর গিন্নী হচ্ছেন সবলা ও সক্রিয়া প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনের বাস্তব অভিব্যক্তি! এক ডজন অপোগণ্ডকে তাড়না করা চাট্টিখানেক কথা নয়! গৃহিণীর শ্রীমুখখানা একবার যে ছুটল পুরো পাঁচটি ঘণ্টা আর তার বিরাম হল না। আমার দিবানিদ্রা মাথায় উঠল, উজবুগের মতো বেঞ্চের এক কোণায় হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে এই বালখিল্যদলের প্রচণ্ড প্রতাপ নিরীক্ষণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। পুরো পাঁচটি ঘণ্টা একটানা হুল্লোড় চলল,—আহার, আচমন, গান, হাতেতালি, বেঞ্চে তবলার চাঁটি, উল্লম্ফন, ডিগবাজি, চুলোচুলি, মুখ ভেঙচানি,—শারীরিক প্রক্রিয়ার কিছুই বাকি রইল না। আদর্শ পুরুষ মুহূর্তের তরেও তাঁর মৌন ও ধৈর্য ভঙ্গ করলেন না,—সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু প্রকৃতি কর্ম-চঞ্চলা, অনবসর, অনর্গল-ভাষিণী। অপোগণ্ডের দল নাছোড়বান্দা। আমি নির্বাক সাক্ষী। পাঁচ ঘণ্টা পরে গাড়ি যখন তার শেষ গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছাল তখন অনুভব করলাম সময় কতো ক্ষিপ্রগামী। পাঁচ ঘণ্টা কাল কেমন করে কেটে গেছে তা এতোক্ষণ টেরই পাই নি! সে বালখিল্যদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ! ধন্যবাদ জঙ্গম বাষ্পবাহনকে। ধন্যবাদ আমার ভ্রমণভাগ্যকে! অথ তৃতীয়শ্রেণী-ভ্রমণ-কথা শেষ!

অনগুলের আম্রকুঞ্জে

একবার অতি অল্প কিছু সময়ের জন্য নিখিল ভারত নয়া তালিমী সংঘের প্রধান কেন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর পদধূলিপূত সেবাগ্রাম আশ্রম পরিদর্শন ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু দেখবার ও জানবার সুযোগ আমার ঘটে নি। বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে পুস্তকে প্রবন্ধে সামান্য যা কিছু পড়েছি তাতে মনের কৌতূহল বেড়েছে, কিন্তু সব সময়ে সে কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নি। মনে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছে যার সদুত্তর বইএর পাতায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রথমতঃ পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখকেরা প্রায় সবাই মহাত্মাজীর পার্শ্বচর ও সহকর্মী,—এক মহাপ্রতিভাশালী নেতা ও যুগ-প্রবর্তকের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটিয়ে উঠে এঁরা কেউই নিজেদের স্বকীয়তা প্রদর্শন করতে পারেন নি,—প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহাত্মাজীর আদেশ নির্বিচারে শিরোধার্য বলে মেনে নিয়েছেন, ফলে এঁরা যা বলতে চেয়েছেন তা হয়েছে মহাত্মাজীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি। আর দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ব বা থিওরির দিক দিয়ে অনেক কিছুই অনিন্দ্য বলে মনে হলেও বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রেই তার প্রকৃত দোষত্রুটি ও গুণাগুণ ধরা পড়ে।

মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুসারিগণের নিকট সান্নিধ্য-

লাভ এবং বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতিগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলাফল জানবার একটা প্রবল আগ্রহ নিয়েই অনগুল সর্বোদয় সম্মেলনে যোগদান করতে যাত্রা করলাম। মহাত্মা-প্রবর্তিত দেশগঠনমূলক নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা,—যথা নয়া তালিমী, গ্রামোদ্যোগ, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, গোসেবা, কুটিরশিল্প, চরখা ও খাদি, হিন্দুস্থানী প্রচার ইত্যাদির একটা সমগ্র ও সংযুক্ত রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে সর্বোদয়ের নানামুখী কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে। মহাত্মাজীর অনুবর্তীরা দাবি করেন যে 'সর্বোদয়ের সাফল্যের ভিতর দিয়েই আসবে জাতির জীবনে সত্য ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত গান্ধীজির ধ্যানের যুগান্তর। এই যুগ-বিপ্লবের আদর্শ অতি মহান ও সুপবিত্র,—এতে প্রত্যেক নরনারীর জীবন হবে সুখ ও শান্তিপূর্ণ, সমাজ হবে অভাব অভিযোগ ও শ্রেণীবিদ্বেষবিহীন এবং সর্বোপরি জাতির অর্থ-নৈতিক জীবন হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসিদ্ধ। রক্তপিচ্ছিল ধ্বংসের পথে এই বিপ্লবের জয়রথ চালিত হবে না,—এই বিপ্লব হবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং জাতীয় জীবনে এর প্রভাব হবে সুদূর-প্রসারী। ভাবী "সর্বোদয়" সমাজ সংগঠনের যে মহতী চেষ্টা চলেছে তারই একটা সুস্পষ্ট ধারণা এই সম্মেলনের উদ্‌যোগ-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পাওয়া যাবে, আমার পক্ষে অনগুল যাত্রার সেটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ।

*   *   *

কটক থেকে ঊনপঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে পুরী-তালচের লাইনের একটি ছোট্ট রেলস্টেশন মেরামণ্ডলী। সেখান থেকে পনর

মাইল মোটর-পথে অধুনালুপ্ত ঢেঙ্কানাল রাজ্যের একটি ছোট মহকুমা শহর হচ্ছে অনগুল। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে ঢেঙ্কানাল এখন উড়িষ্যার একটি জেলামাত্র। অনগুল শহরটি আয়তনে বেশ বিস্তৃত কিন্তু সেই অনুপাতে জনবিরল। দিগন্তবিস্তৃত রাঙা মাটির ঢেউখেলানো মাঠ। দূরে দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে ঢেঙ্কানাল পর্বতশ্রেণী—পাদদেশ নানা হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। ফাঁকা প্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকালয়, সরকারী অফিস, ডাকঘর, স্কুলবাড়ি ইত্যাদি ছবির মতো সাজানো। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমগ্র পরিবেশটি শান্ত, সুন্দর ও লোভনীয়। শত সমস্যাখিন্ন কলকাতার কঠোর, কৃত্রিম ও নিষ্করুণ জীবন-সংগ্রামের লেশমাত্র আভাস এখানে নেই। জীবন তরী বহিয়া যায় মন্দাক্রান্তা তালে।

*　　*　　*

প্রকাণ্ড এক মাঠে কতকগুলি আম্রকুঞ্জকে কেন্দ্র করে সম্মেলনের শিবির সন্নিবেশিত হয়েছে। খড়ের চাল ও গোটা বাঁশের বেড়া দেওয়া অনেকগুলি লম্বা লম্বা ছাউনিতে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি ও দর্শক প্রভৃতির ক্যাম্প, সম্মেলনের অফিস-ঘর, রন্ধনশালা ও ভাঁড়ার স্থাপিত হয়েছে। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় অনাবৃত চত্বরে সভামণ্ডপ, কয়েকটা তক্তপোশ জড়ো করে সভাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট আগন্তুকগণের বসবার জায়গা। সাধারণ দর্শক ও প্রতিনিধিগণের জন্য নিচে সতরঞ্চি ও চ্যাটাইয়ের আসন। আমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ, উদ্‌যোক্তা ও কর্মী নিয়ে সম্মেলনের মোট জনসংখ্যা প্রায় দু-হাজার। একটা

বড়ো ছাউনির নিচে প্রতিদিন তিন বেলা এই দু-হাজার লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত। সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সভা-সমিতি, বক্তৃতা, প্রার্থনা, স্নানভোজন, পানীয়জল সরবরাহ, মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা ও আবর্জনা নিষ্কাশন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্যের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনা। এতো বড়ো একটা অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক কোন বৃথা আড়ম্বর বা হৈ-চৈ হট্টগোল নেই। সবই অত্যন্ত সহজ, অনাড়ম্বর এবং সুশৃঙ্খল। সমস্ত ব্যাপারটির মূলে ছিল একটা সম্মিলিত আত্মনির্ভর প্রচেষ্টা। রন্ধন ও পরিবেশন ছাড়া আর সব কাজই দর্শক ও প্রতিনিধিরা নিজেরাই করেছেন। কোন পরিচারক-পরিচারিকার বালাই নেই।

ভোর ৪॥টায় শয্যাত্যাগ ও তৎপরে সমবেত প্রার্থনার পরই শুরু হত সাফাই। নয়া তালিমের কারিকুলামে সাফাইএর স্থান সর্বাগ্রে। মহাত্মাজী নিজে এই নিত্য কার্যটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। শুনা যায় দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ফিরে মহাত্মা (তখন মিঃ গান্ধী) প্রথম যখন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করতে আসেন তখন কবিগুরুর নিকট হতে নিজ হাতে শান্তিনিকেতনের প্রাতঃকালীন সাফাইয়ের কাজটি তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন। সেবাগ্রামেও দেখেছি যে আশ্রমিকদের নৈমিত্তিক কাজ শুরু হয় সাফাই দিয়ে, এবং কী নিষ্ঠার সঙ্গেই না প্রত্যেকটি নরনারী এই কাজটি সম্পন্ন করেন। নিজ নিজ বিছানাপত্র, ঘরদোর হতে আরম্ভ করে বিস্তৃত সম্মেলন-প্রাঙ্গণটি, মাঠ, রাস্তাঘাট মায় মলমূত্রাগারগুলি পর্যন্ত সবই নিজেদের

সাফা করতে হত! এতে কোন শ্রেণী বা পদমর্যাদা বিভাগ ছিল না,—বড়ছোট মান্যগণ্য সকলকেই এ কাজে অংশ গ্রহণ করতে হত! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের সমবেত চেষ্টায় বিরাট সম্মেলন-প্রাঙ্গণটির একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটে উঠত। মহাত্মাজী বলতেন, "যদি গ্রামের সেবা করতে চাও তবে ভাঙ্গি হয়ে যাও!" সর্বোদয় সম্মেলনে এসে এই ব্যাপক ও সম্মিলিত সাফাই কাজের প্রকৃত তাৎপর্য ভালো করে বুঝতে পারলাম। এতগুলি লোক প্রতিদিন একসঙ্গে স্নান, আহার, ওঠাবসা, চলাফেরা ও মলমূত্র ত্যাগ করেছে অথচ তার দরুন বিন্দুমাত্র হৈ-চৈ, দুর্গন্ধ, আবর্জনা বা মশা-মাছির উৎপাত নেই। কোন বেতনভোগী ভৃত্য বা মেথর-মুদ্দফরাশ নিযুক্ত করা হয় নি, প্রত্যেকের সহযোগিতায় অতি অল্প আয়াসে এবং বিনা অর্থব্যয়ে এই বিরাট অনুষ্ঠানের প্রতিটি কাজ নিষ্পন্ন হচ্ছে। সম্মিলিত ভাবে সমাজ জীবন সুনিয়ন্ত্রণের এ এক সার্থক পরীক্ষা।

প্রায় দুই শতাধিক পুরুষ ও নারী কর্মী সম্মেলনে স্বেচ্ছা-সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের বেশীর ভাগই তরুণ তরুণী। এঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার এবং নিরলস কর্মনিষ্ঠা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেছিলেন উড়িষ্যার সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা সস্ত্রীক শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী ও তাঁর ভ্রাতা প্রাক্তন-মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। গোপবন্ধুবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রমা দেবী এবং নবকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মালতী দেবী উভয়েই সম্মেলনের অধিবেশন ও অন্যান্য যাবতীয়

আয়োজন ত্রুটিহীন ও সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এঁদের দেশসেবা, কর্মকুশলতা ও অমায়িক ব্যবহার উড়িষ্যাবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

সম্মেলনে যে সকল বিশিষ্ট নেতা ও দেশকর্মী যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাকা কালেলকার, অধ্যাপক জে. সি. কুমারাপ্পা, আর্যনায়কমজী, মন্ত্রী রাজকৃষ্ণ বসু, মন্ত্রী লিঙ্গরাজ মিশ্র, মন্ত্রী মাধব মেনন, রাজ্যপাল জনাব আসফ আলি, কংগ্রেস সম্পাদক শঙ্কররাও দেও, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

* * *

প্রতিদিন নাস্তা বা প্রাতরাশের পর সকাল সাতটায় শুরু হত সূত্রযজ্ঞ বা চরখায় সুতো কাটা। আম্রকুঞ্জের ছায়ায় একসঙ্গে প্রায় হাজার চরকা ও তক্‌লিতে এক ঘণ্টা সুতো কাটা চলত। সঙ্গে চলত লাউডস্পীকার সংযোগে গ্রামোফোন সঙ্গীত। অনেকেই দেখতাম সভার কাজ শুরু হওয়ার পরও বক্তৃতা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সুতো কাটাও চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিষ্ট চিত্তে নীরবে সুতো কেটেই চলেছেন। সংযম ও অভ্যাসের গুণে এঁরা নাকি একই সঙ্গে দুই কাজেই সমভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। কথাটার সত্যতা পরখ করে দেখবার উপযুক্ত। সকাল আটটা হতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সভার কাজ আরম্ভ হত এবং চলত বেলা বারোটা পর্যন্ত, আবার মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বেলা দুটো থেকে বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর সান্ধ্য প্রার্থনা ও ভোজন এবং কোন

কোন দিন রাত্রিতেও ১০।১১টা পর্যন্ত আবার সভার কাজ। সভার প্রধান কাজই ছিল বক্তৃতা—অধিকাংশই হিন্দীতে, ক্বচিৎ দু-একজন ইংরাজীতেও বক্তৃতা করতেন। বিহারের অন্তর্গত বিক্রমে অনুষ্ঠিত নয়াতালিমী সংঘের বিগত অধিবেশনে নাকি ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এবারে দেখলাম কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনেকটা উদারতা প্রদর্শন করলেন। পাঁচদিনে অন্ততঃ ৫০।৬০ জন বিভিন্ন বক্তার হিন্দী ভাষণ শুনবার সুযোগ হয়েছিল। জওহরলালজী ও সর্দার প্যাটেল ছাড়াও বহু খ্যাত ও অখ্যাত নেতার হিন্দী ও উর্দু বক্তৃতা এর পূর্বে বহুবার শুনেছি, এবারেও শুনলাম। হিন্দী আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরাজী বাতিল হয়ে যাবে, এবং তার স্থান অধিকার করবে হিন্দী। দ্বিধা, সঙ্কোচ এবং খানিকটা ভয়ে ভয়েই একটা কথা বলতে চাই। বক্তৃতার ভাষা হিসাবে ইংরাজী, বাংলা, এমন কি উর্দুর তুলনাতে হিন্দী এখনও পর্যন্ত বহুলাংশেই অপরিণত ভাষা। শব্দের দৈন্য ও ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্যহীনতাই বোধ হয় হিন্দীর প্রধান অভাব। বক্তারা কেউই বিশুদ্ধ হিন্দীতে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেন নি বা করেন নি। ইংরাজী শব্দের বহুল ব্যবহার এবং একই ক্রিয়াপদের (হ্যায়) বারংবার প্রয়োগ বড়ই শ্রুতিকটু বোধ হয়। তা ছাড়া ভাবাভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা প্রকাশে হিন্দী ভাষা কিছুতেই ইংরাজী বা বাংলার সমকক্ষ নয়। এদিক দিয়ে হিন্দীর আরও উন্নতিসাধন হওয়া আবশ্যক।

*　　　*　　　*

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব,—শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সৃজনী শক্তি (Creative power) এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ (integrated development of personality) সাধন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও পরিবেশ হতে ফরমায়েসী এবং নিছক কেতাবী বিদ্যার বোঝা যা এতদিন ধরে শিক্ষার নামে এদেশের ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তারই আমূল পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আনয়ন করবার ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজির শিক্ষানীতি একদিক দিয়ে যেমন অভিনব, অন্যদিকে তেমনি বিপ্লবাত্মক।

গান্ধীজির নব শিক্ষানীতির পূর্ণ তাৎপর্য এখনও সবাই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দেশ এখনও সমগ্রভাবে এই নীতি গ্রহণ বা কার্যে পরিণত করতে পেরেছে একথা বলাও ঠিক হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষার সম্ভাব্যতা ও নীতিগত বহু প্রশ্নই আজ দেশের শিক্ষাবিদ্-মাত্রেরই গভীর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন, প্রসার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নই ছিল সর্বোদয় সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। খুবই আশা করেছিলাম যে সম্মেলনের অধিবেশনে যে সব শিক্ষাবিদ্ ও কর্মী যোগদান করেছেন তাঁদের ভাষণ, বক্তৃতা ও বিবরণীতে বুনিয়াদি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য উত্তর মিলবে। ভেবেছিলাম যে আজ শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রে যে সকল

সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার আশু সমাধান মিলবে এই সম্মেলনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত যে সব ভাষণ, বক্তৃতা ও বিবরণী শুনলাম তা থেকে প্রকৃত সমস্যার সমাধান সম্বন্ধীয় কোন স্থির নির্দেশ পাওয়া গেল না।

সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ভাষণ ও বিবরণীগুলিকে মোটা-মুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম বিবরণমূলক, অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্ট। এই সব রিপোর্টে কোথায় কতগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কি সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা পাচ্ছে এবং কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশন করা হল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিবৃতি পাঠ করলেন, বৈগাছি শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হিমাংশুবিমল মজুমদার। দ্বিতীয়, শিক্ষাবিদ্‌গণের ভাষণ,—বুনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব ও নীতির ব্যাখ্যা। তৃতীয়, প্রশ্নোত্তরিকা। খুব আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গেই বিশিষ্ট বক্তাগণের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরিকাগুলি অনুধাবন করবার চেষ্টা করলাম। বুনিয়াদীর প্রকৃত স্বরূপ, সম্ভাব্যতা, প্রয়োগক্ষেত্র ও অন্যান্য নানাবিধ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত এই সব আলোচনার ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হবার কথা। প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতি মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমাধব মেনন যে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলেন তার মূল কথা হল এই—

"বুনিয়াদী শিক্ষা জিনিসটা আমি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি। কিন্তু আমার দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বারবার বুঝতে পেরেছি যে যখনি

কোন বিষয়ে আমি গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি অথবা গান্ধীজির সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে তখনই দেখেছি যে পরিণামে গান্ধীজির কথাই অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আজ আমি খুব জোরের সঙ্গেই এ কথা বলব যে যেহেতু স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদীর প্রবর্তক—সেহেতু বিনা দ্বিধায় বুনিয়াদীকেই আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।"

অন্যান্য প্রায় সকল বক্তাই সভাপতির কথারই প্রতিধ্বনি করলেন।

গুরুবাদ ও ভক্তিবাদ অতি উচ্চাঙ্গের জিনিস। মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক, ভারতের মুক্তিদাতা—তাঁর কথা ও তাঁর উপদেশ অলঙ্ঘ্য ও সর্বতোভাবেই প্রতিপাল্য, কিন্তু তাই বলে তাঁকে না বুঝে বা বুঝবার চেষ্টা না করে কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বশে তার পথ অনুসরণ করবার যুক্তি খুব সারগর্ভ বলে মনে হয় না। অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে এই অন্ধ বিশ্বাসের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

আর একটা জিনিস এই সম্মেলনে লক্ষ্য করলাম; সেটা হচ্ছে এই যে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অবসর ও সুযোগ বড়ো একটা কাউকেই দেওয়া হয় নি। বক্তারা প্রায় সবাই যেন এক বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, একটা নির্দিষ্ট মতবাদের সমর্থক এবং তাঁদের বক্তব্য বিষয়ও একই ছাঁচে ঢালা।

এঁরা অবশ্য প্রায় সকলেই কর্মী এবং এঁরা যা বলছেন

তার পিছনে রয়েছে প্রকৃত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, কাজেই এঁদের উক্তির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। কিন্তু এঁরা সবাই বুনিয়াদীকে নির্বিচারে ও নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন, যুক্তি বা বিশ্লেষণের ধার দিয়েও যান নি। বুনিয়াদীর কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে বা থাকতে পারে একথা তাঁরা মানতে রাজী নন। অন্ধ বিশ্বাস স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণকে অনেকখানি খর্ব করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবস্থাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

*　　*　　*　　*

প্রশ্নোত্তরিকার ভিতর দিয়েও নয়া তালিমী ও বুনিয়াদী শিক্ষার নেতৃবৃন্দের যে মনোভাব ব্যক্ত হল তা অনেকের কাছেই খুব প্রীতিকর বোধ হয় নি। সাধারণ অধিবেশনের পর একদিন কিছু সময় নির্দিষ্ট হল প্রশ্ন করার ও প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য।

অনেকেই ছোট কাগজের খণ্ডে তাঁদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি লিখে সভাপতির বা আর্যনায়কমজীর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আবার কেউ কেউ উপস্থিত ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রশ্নগুলি উত্থাপন করলেন। কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তরে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণের নমুনা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

প্রশ্ন :—বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত সেবাগ্রামের আদর্শে পল্লী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে, যথেষ্টসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হবে কি ?

উত্তর :—কে এই প্রশ্নটি করেছেন ? (প্রশ্নকর্তা দাঁড়িয়ে

নিজের পরিচয় দেবার পর)—আপনার এই প্রশ্নের জন্য আমি দুঃখিত। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট এখনও বিবেচনাধীন, আপনি আসন পরিগ্রহ করুন।

প্রশ্ন :—সেবাগ্রাম বা অন্য বুনিয়াদি শিক্ষণ-কেন্দ্রে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। শিক্ষকের অভাবে কী ভাবে দেশের সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হতে পারে ?

উত্তর :—বুনিয়াদী নীতি ও পদ্ধতিতে শিক্ষিত বিশ্বাসবান শিক্ষক যথেষ্ট সংখ্যায় না পাওয়া গেলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাই স্থগিত রাখা হবে।

[এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই উত্তরে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী প্রতিবাদে বললেন যে এই নীতি গৃহীত হলে দেশে শিক্ষার প্রগতি ব্যাহত হবে, —এই নীতি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়]।

প্রশ্ন :—উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণাদির ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কতদূর প্রয়োগ-যোগ্য ?

উত্তর :—পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অধ্যয়ন করেছি। বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী আমার আছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা বলতে কি বুঝায় তা আমার ভালই জানা আছে। এ বিষয়ে আমি একজন অথরিটি বা বিশেষজ্ঞ। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে উচ্চ শিক্ষা কি ভাবে দেওয়া যায় তা আমার ভাল রকমই জানা আছে।

প্রশ্ন :—সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে যে ভাবী সমাজ

সংস্থাপন বুনিয়াদী শিক্ষার পরম ও চরম আদর্শ বলে ঘোষিত হয়েছে—সেই সমাজব্যবস্থায় সামরিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর :—সামরিক শিক্ষা বলতে আপনি কি বুঝেন ? যদি শিক্ষা প্রকৃত কী তা বুঝতে চান, তবে চলুন আমার সঙ্গে দিল্লীর বাস্তুহারা শিবিরে, আপনাকে দেখিয়ে দেব আমাদের কর্মীরা সেখানে কি করছেন। আপনি "সামরিক শিক্ষা"র প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

টীকা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু কথাই যথেষ্ট যে শিক্ষাক্ষেত্রে indoctrination-এর পরিণাম অত্যন্ত অশুভ।

সমাপ্ত